দাম : ৭০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪২২
৫ অক্টোবর - ২০১৫

Neelam

FOR ANY ROAD ANY LOAD

Prepare yourself for an unforgettable ride with the stunning Neelam Shox. Attractive colors and incredible strength makes it different from others.

Neelam Jaguar

Neelam Ridge

Neelam Traveller

Neelam Ultra

Neelam Bold

Neelam Akash

Neelam Spin 20T

Neelam Platinum

Seth Industrial Corporation

H.O.80-A, Industrial Estate, Ludhiana - 141003 (INDIA)

Phones : 91 161 2530320,4626601, 4626602, Fax : 91 161 2544320

www.neelamcycles.com | MANUFACTURERS | EXPORTERS | IMPORTERS | info@neelamcycles.com

নারীর প্রথম পছন্দ
Mala
COTTON SAREES
SHREE BALAJI (MALA) TEXTILES PVT. LTD.
180, M.G. Road, 2nd Floor, Kolkata 700007
Ph. (033) 3240 9958, Office: +91 98301 57600, Mob: +91 98301 35800
email: mala_sarees@yahoo.com, Web: www.malasarees.com

SHIRTS | TROUSERS | T-SHIRTS | PYJAMAS | BERMUDAS | LADIES WEARS | KIDSWEARS

Shop on line
www.ttgarments.com

Phone / E-mail / Website:
1800 1035 681 Toll Free
export@tttextiles.com
www.tttextiles.com

Follow us on

T.T. is a well known Multi Product Global Brand selling in 65 countries Since 1964.

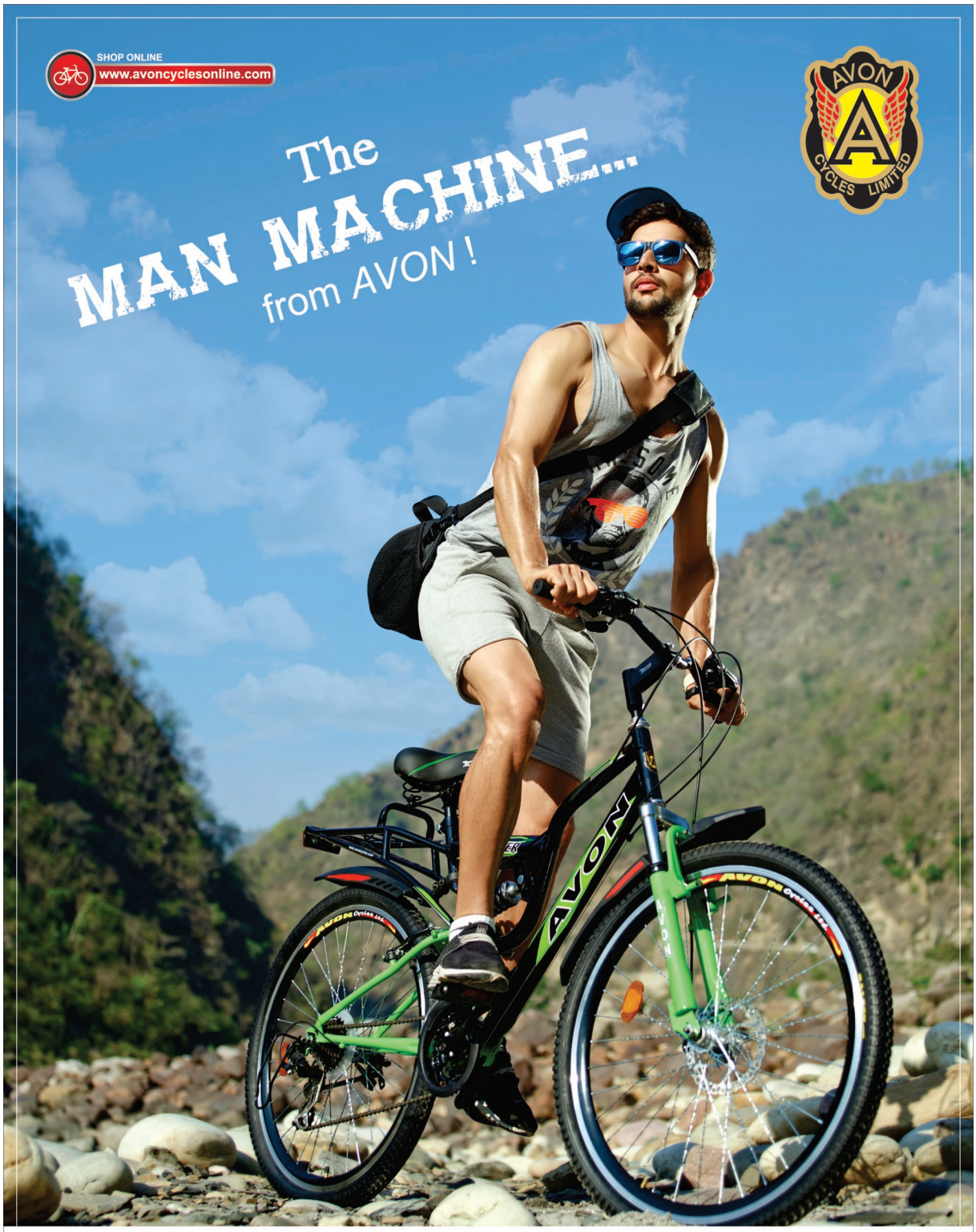

AVON CYCLES LIMITED

G.T. Road, Ludhiana-141 003 (India) Ph : 0161-4684800 (100 lines)
www.avoncycles.com Email: avon@avoncycles.com /avoncyclesofficial

JANAK
customers are our pride
(An ISO 9001:2008 Co.)
SURVEYING INSTRUMENT
TOTAL STATIONS
CONSTRUCTION LASERS
GIS/GPS HANDHELDS
GNSS REFERENCE STATIONS
CONSTRUCTION LASERS
GPS/GNSS SURVEYING SYSTEMS
LASER DISTANCE METER
LEVELS
SURVEYING ACCESSORIES
THEODOLITES
JANAK POSITIONING & SURVEYING SYSTEMS (PVT) LTD.
304-B, Pal Mohan Plaza, 11/56,D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi- 11000
Mobile: 9818108317, 9810738317, 9873145755
Tel : 011-23515400, 23515399, 23617190
B-28, Sector - 4, Noida
Tel : 120 4221720, 4221820, 2544445
Email : janakji@janaksurvey.in , janak.ji@yahoo.com
Website : www.janaksurvey.com

RALSON (INDIA) LIMITED

Works: Ralson Nagar, G.T. Road, Ludhiana-141003 Tel: 0161-2511501 upto 510
Fax: 0161-2511511, 2511512 e-mail: ho@ralson.com & info@ralson.com

International Panaacea Limited

(An ISO 9001 : 2008 Company)

Farmer's First Choice

Bio-fertilizers

Bio-pesticides

Benefits of Bio-fertilizers & Bio-pesticides

- Safe and Eco friendly
- Rejuvenate soil and maintains fertility
- Solution for sustainable agriculture & organic farming
- Substitute of chemical fertilizers & pesticides

Chemical Pesticides are poisonous, causes cancer, damages agri land and the eco system.

E - 34, 2nd Floor, Connaught Circus, New Delhi 110001, INDIA, Tel.: 011 43667200 - 06, Fax: 011 23416889, Website: www.ipibiotech.com
Customer Care: +91 11 23416888 (All working days 10 am to 6:30 pm), Works: Plot No. 42 to 48, Sector - 5, IIE, SIDCUL, Haridwar 249403, Uttarakhand

A M2K Group Company

Hero sprint
NEXT
HERO
CYCLES
World 1
ADD THRILL TO
YOUR EVERYDAY LIFE
With a lightweight body and attractive young looks, the all new Hero Sprint range is sure to excite you!
Hero Sprint product range:
STUDD
RX1
GLEAM
JAVELIN
Visit www.herocycles.com. Call us on our Toll Free number: 1800-208-4376.
HeroCyclesOfficial
Hero_Cycles
HeroCycles

চিরায়ত সাজে
চিরনতুন সঙ্গমে

- নজরকাড়া রঙ
- জমাট বুনন
- অনন্য ডিজাইন
- উৎকর্ষে সেরা

Sangam™

SHATABDI

MALAI COTTON

Cotton & Voil Sarees

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ১৭ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৫ অক্টোবর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ৭০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

দেবীপ্রসঙ্গ

নাম মাহাত্ম্যে দেবী দুর্গা — **নবকুমার ভট্টাচার্য : ১৪**

উপন্যাস

তোরা কোন গগনের তারা? (সামাজিক উপন্যাস)— **সুমিত্রা ঘোষ : ৬৯**

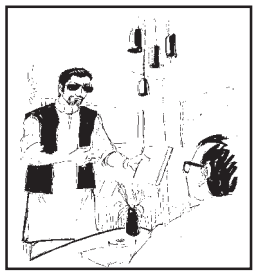

নৈরাজ্য (রহস্য উপন্যাস) — **শেখর সেনগুপ্ত : ১৩৩**

বড় গল্প

জরায়ুর যন্ত্রণা — **গোপালকৃষ্ণ রায় : ১০৭**

জয় হিন্দ — **এষা দে : ১৯৫**

গল্প

প্রমাণ চাই —**রমানাথ রায়** : ২৭

কণিকার স্বপ্ন— **শেখর বসু** : ৫৫

নতুন বউয়ের গন্ধ — **তপন বন্দ্যোপাধ্যায়** : ১৬৩

প্রথম আঘাত — **গোপাল চক্রবর্তী** : ২০৭

পরাণ সখা— **গার্গী দেব** : ২৪৩

অনেকদিন পর — **সমর মিত্র** : ২৫৯

আজ অমিতার বিয়ে — **চন্দ্রাণী সাধুখাঁ (বিশ্বাস)** : ২৭৭

রম্যরচনা

চিঠি মিঠি — **পিনাকপাণি ঘোষ** : ২৪৯

প্রবন্ধ

দুর্গা : রাষ্ট্র পরিকল্পনার নিখুঁত ছবি — **বরুণ দাস** : ১৯

সঙ্ঘ সাধনা ও তার সমালোচকরা — **রমেশ পতঙ্গে** : ২১

মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস - রবীন্দ্রনাথের সন্ধান — **অচিন্ত্য বিশ্বাস** : ৩৫

হলোকস্ট : ইয়োরোপে খৃষ্টানদের ব্যাপক ইহুদী-নিধন যজ্ঞ — **ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী** : ৪৩

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন — **অমলেশ মিশ্র** : ৬১

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা কার্যত একটি আন্তর্জাতিক গ্রন্থই — **দেবীপ্রসাদ রায়** : ১১৯

জমি অধিগ্রহণ : স্বদেশ ও বিদেশ — **নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য** : ১২৭

জন্ম সার্ধশতবর্ষে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় : ভারতের জাতীয় সংগ্রামের যুগনায়ক — **ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়** : ১৭১

বিজ্ঞানের আলোয় অবতার তত্ত্ব — **দেবব্রত ঘোষ** : ১৭৯

রবীন্দ্রনাথ ও প্রতাপাদিত্য — **ড. প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী** : ২২৩

চলচ্চিত্র আর সেন্সর বোর্ড — **সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়** : ২২৯

পশ্চিমবঙ্গের শেষের দিনগুলি দেখতে পাচ্ছি — **মোহিত রায়** : ২৬৩

পশু-পাখির মাতৃস্নেহ — **তাপস অধিকারী** : ২৩৩

সেকালের মেসবাড়ি — **অর্ণব নাগ** : ২৬৯

পুরাণ কথা

এক রূপান্তরিত পুরুষের কথা — **বিজয় আঢ্য** : ১৮৫

চরিতকথা

কলকাতায় প্রথম নিবেদিতা — **জহর মুখোপাধ্যায়** : ২১৫

ভ্রমণ

রথ উৎসবে হাম্পি— **সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস** : ২৮৩

বিনোদন

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত — **বিকাশ ভট্টাচার্য** : ২৯১

খেলা

বিষ্ণুপুরের দশাবতরী তাস— **জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়** : ২৯৩

নবাঙ্কুর

ছোট ছেলে বড় ছেলে (গল্প) — **সিদ্ধার্থ সিংহ** : ২৯৫

ইচ্ছে (গল্প) — **বিরাজ নারায়ণ রায়** : ২৯৯

অঙ্কের ধাঁধা — **শৌনক রায়চৌধুরী** : ৩০৩

শব্দরূপ — **শান্তনু গুড়িয়া** : ৩০৪

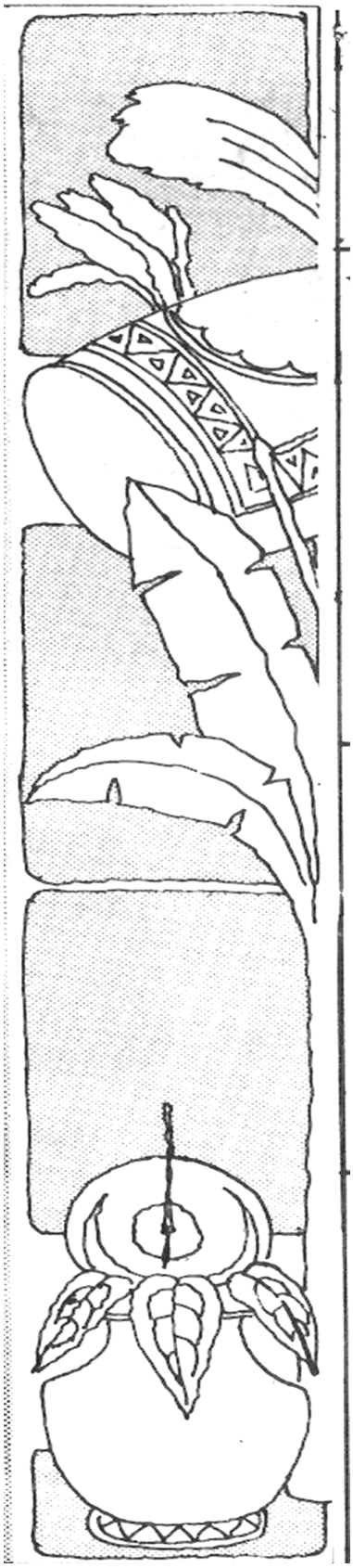

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।। শ্রীশ্রীচণ্ডী

— হে দেবি! সমস্ত বিদ্যা ও জগতের যাবতীয় স্ত্রী-জাতি তোমার অংশস্বরূপ, হে জননী, একমাত্র তোমার দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া আছে। স্তব করিবার যোগ্য কোন্ বাক্য দ্বারা তোমার স্তব করিব?

নাম মাহাত্ম্যে দেবীদুর্গা

নবকুমার ভট্টাচার্য

দক্ষযজ্ঞে দক্ষতনু ত্যাগ করে শিবপ্রিয়া সতী হিমরাজ গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পবিত্র গার্হপত্য ব্রতের সূচনা করেই এ জন্ম। এদেশে সন্তান জন্ম শুধুমাত্র সম্ভোগ কামনার বিলাসমাত্র নয়। সন্তান শুদ্ধ দাম্পত্যের তপশ্চর্যার ফল। পরমা প্রকৃতিকে কন্যারূপে লাভ করার জন্য হিমরাজ ও মা মেনকা সেই সাধনাই করেছিলেন। দীর্ঘ সাতাশ বছরের সাধনার শুভ পরিণাম মেনকাগর্ভে জগন্মাতার জন্ম। পর্বতের কন্যা বলে নাম হয় পার্বতী।

পার্বতীর জন্মকালেই মা মেনকা তাঁকে পরম শিবের শক্তিরূপা জেনে যে নামকরণ করেছিলেন তা হল উমা। ভারতচন্দ্র তাই বলেছেন— 'উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার। বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার।' কালিকাপুরাণ মতে, মা মেনকা কন্যাকে বনে গিয়ে তপস্যা করতে নিষেধ করেছিলেন বলেই পার্বতীর নাম হয়েছে উমা। কবি কালিদাসও উমা নামের এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করেছেন। দুশ্চর তপস্যার কারণে পার্বতীর 'পঞ্চতপা' নামটিও প্রসিদ্ধ হয়েছে। শিবকে স্বামীরূপে লাভ করার জন্য তিনি হিমালয়ে শিবের তপোভূমিতেই তপোরতা হয়েছিলেন। পাঁচ প্রকারের কঠিন তপস্যাই পঞ্চতপ। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সামনে আগুন জ্বেলে তিনি এক পায়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। অশান্ত বর্ষায় আচ্ছাদনশূন্য স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি শিবনাম জপ করতেন। দারুণ শীতে হিমশীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে শিবের ধ্যান করতেন। প্রবল ঝড়ে তিনি উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে হরের কথা ভাবতেন। হিংস্র জন্তুর আক্রমণকেও তিনি উপেক্ষা করতেন। বাত-আতপ-শীত-বৃষ্টি-জন্তুর ভয় তাঁকে সাধনভ্রষ্ট করতে পারেনি। পঞ্চভূতের তাড়নাকে জয় করে পার্বতী হয়েছিলেন 'পঞ্চতপা'। প্রেমের জন্য বন্মচারিণী পার্বতীর এই কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য তাঁর নাম হয়েছে 'অপর্ণা'। অর্থাৎ বৃক্ষ হতে স্বয়ং পতিত শুষ্ক পত্রদ্বারা জীবনধারণ করাই তপস্যার চরম উৎকর্ষ, কিন্তু পার্বতী সেই পর্ণাহারও বিসর্জন করলেন। সেই হেতু তাঁর নাম 'অপর্ণা'। এসম্বন্ধে মহাকবি কালিদাস 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যে লিখেছেন—

'স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুম পর্ণবৃত্তিতা পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়াঃ পুনঃ
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্ত পর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ।।'

বিবাহের পূর্বে পার্বতী আরও দুটি নামের অধিকারী হয়েছিলেন। 'চন্দ্রঘণ্টা' (মতান্তরে চণ্ডঘণ্টা) ও 'কুষ্মাণ্ডা'। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'হিমালয়ের পার্বতী' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'চন্দ্রঘণ্টা মানে রাকাচন্দ্রের মতো অপরূপ লাবণ্যময়ী। অঙ্গবর্ণের দিক থেকে পার্বতী ছিলেন শ্যামা। তাই তাঁকে বলা হত কালী। কিন্তু এই কালো রূপের মধ্যেই ছিল অপূর্ব এক মাধুরী। কালিদাস যা লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ''পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষাণ্'। কালীর স্বাভাবিক লাবণ্য তপস্যায় আরও উজ্জ্বল হয়েছিল। একদিকে তপোদীপ্তি অন্যদিকে প্রণয়ে সিদ্ধকামা কুমারীর তৃপ্তমাধুর্য। একদিকে সলাজ অরুণিমা অপরদিকে আনন্দের স্মিত হাসি। সব মিলিয়ে কালী হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের মনোমোহিনী। রবীন্দ্রনাথ তপস্বিনীর এই রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন— 'লাবণ্যপরাক্রান্ত যৌবনকে পরাভূত করিয়া পার্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতির্লেখার মতো উদিত হইল।' এর উপরে মা মেনকা মেয়ের অঙ্গে তুলে দিলেন রাজকন্যার অঙ্গসজ্জা— ক্ষৌমবসন, সুগন্ধি অনুলেপন, দিব্য অলঙ্কার। পার্বতী হলেন অপরূপ লাবণ্যবতী যেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের চন্দ্রিকা। পার্বতীর এই রূপটিই 'চন্দ্রঘণ্টা' নামে প্রসিদ্ধ। এ যেন দগ্ধকামকে পুনরুজ্জীবিত করার রূপ। অকাম শিবকে সকাম করে তোলার জয়ঘণ্টা।' দুর্গাপ্রদীপ টীকাতে চন্দ্রবৎ নির্মল ঘণ্টা যাঁর অথবা যিনি চন্দ্রপেক্ষা অতিশয় লাবণ্যবতী তিনিই 'চন্দ্রঘণ্টা'। রহস্যগম নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে— 'আহ্লাদকারিণী দেবী চন্দ্রঘণ্টেতি কীর্ত্তিতা।' কালিকাপুরাণেও চন্দ্রঘণ্টা নাম দৃষ্ট হয়। 'চন্দ্র ঘণ্টা যস্যাঃ' যাঁর করধৃত ঘণ্টা প্রচণ্ড শব্দকারী সেই দেবীর নাম চন্দ্রঘণ্টা।

সপ্তসতী চণ্ডীগ্রন্থের দেবীকবচের সূচনায় দেবীর নয়টি নামের উল্লেখ আছে— 'প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী। তৃতীয়ং চণ্ডকটেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্। পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা। সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্। নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতা।' একমাত্র কাত্যায়নী নামটি বাদ দিয়ে অন্য নামগুলি পার্বতীর গৃহজীবনের পরিচয়বহ। কাত্যায়নী হলেন রণরঙ্গিণী মহিষমর্দিণী দুর্গা। তাঁর লীলাক্ষেত্র হিমালয় নয় বিন্ধ্যাচল। নবদুর্গার প্রথম চারটি নামের লীলাভূমি হিমাচল আর শেষের চারটি নামের লীলাক্ষেত্র কৈলাস।

দেবীপুরাণ মতে (৩৭।৩৫) 'জাতা শৈলেন্দ্র গেহে সা শৈলরাজসূতা ততঃ।' শৈলরাজ হিমালয়ের গৃহে জন্ম হয়েছিল বলে দেবী 'শৈলপুত্রী' নামে অভিহিতা হন। দেবীই জীবকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। ব্রহ্মস্বরূপ অবগত করিয়ে দেন এই কারণে তাঁর একটি নাম ব্রহ্মচারিণী। দেবীপুরাণের মতে, 'বেদেষু চরতে যস্মাৎ তেন সা ব্রহ্মচারিণী' (৩৭।২৭)। সর্ববেদে বিচরণ করেন বলে দেবীর ব্রহ্মচারিণী নাম হয়েছে। বামনপুরাণের মতে, সতীর দেহত্যাগের পর শিব অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েন। তাই তিনি প্রথমে পার্বতীর অভিলাষে আকৃষ্ট হননি। কালিকাপুরাণ ও শিবপুরাণে পার্বতীর উপস্থিতিতেই মদন ভস্ম হয়েছে। শিবের এই প্রত্যাখ্যান পার্বতীর জীবনে এনে দিল রূপান্তর। তাঁকে প্রতিষ্ঠা করল ব্রহ্মচারিণী রূপে। চাঞ্চল্যের স্থলে এল গাম্ভীর্য, ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে এল ত্যাগ সংযম, অপ্রাপ্তির নিরাশা দূরীভূত হল প্রাপ্তির স্থিরলক্ষ্যে। প্রতিজ্ঞা করলেন তপস্যার বলেই তিনি অকাম প্রেমিককে সকাম করে পতিরূপে লাভ করবেন। রবীন্দ্রনাথ উচ্ছসিত ভাষায় এই তপশ্চার্যার প্রশস্তি করেছেন। 'কুষ্মাণ্ডা' নামটি হৈমবতী পার্বতীর সংযমশুদ্ধ চরিত্রের একটি দিকের পরিচয়। বাংলা শিবায়ন কাব্যের কবি রামকৃষ্ণ বলেছেন, স্ত্রীত্ব বর্জিত 'ষণ্ডকলেবর' যাঁর, তিনি কুষ্মাণ্ডা অর্থাৎ নপুংসক। এই প্রসঙ্গে কুমারী পার্বতীর একটি কাহিনিও বিবৃত হয়েছে— বিবাহের পূর্বে পার্বতী নিত্য শিবপুজো করতেন। প্রথমে গঙ্গাস্নান করে সহচরীদের নিয়ে ফুল তুলতেন। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে তিনি বহুদূরে চলে যান এবং সঙ্গীচ্যুতা হয়ে শিবের বাগানে প্রবেশ করেন। তিনি জানতেন না এই উদ্যান শিবের। পার্বতী মনের সুখে ডালপালা ভেঙে পুষ্পচয়ন করতে লাগলেন। তাই দেখে ছুটে এলেন বাগানের প্রহরী নন্দী। শিবের মালঞ্চে কে ফুল তোলে! নিষেধ করা সত্ত্বেও পার্বতী নিরস্ত হলেন না। নন্দী গিয়ে শিবকে সংবাদ দিলেন। শিব ধ্যানে জানতে পারলেন মালঞ্চে এসেছে তাঁরই বাগদত্তা পার্বতী। আনন্দিত চিত্তে তিনি চললেন প্রিয়া মিলনের উদ্দেশ্যে। পার্বতীও জানতে পারলেন এই উদ্যান শিবের এবং তিনি এখনই হয়তো আসবেন। পাছে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে অপরিণীতা কুমারীর সঙ্গে মিলিত হন, এই ভয়ে পার্বতী মাধবীলতায় তাঁর গুপ্তঅঙ্গ স্থাপন করে 'ষণ্ডকলেবর' অর্থাৎ কুষ্মাণ্ডা হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। এলেন শিব। শিবের উদ্দাম লালসা অনুমান করে বনের বৃক্ষলতারা তাঁকে বললেন, 'প্রভু, দেবীর পিতৃকুলের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত।' শুনে শিবও তাঁর অস্থির পৌরুষ চাঁপাফুলে রক্ষা করলেন। লোকাচারের অনুরোধে কেউ কাউকে স্পর্শ করলেন না অথচ পার্বতী ক্রীড়াকৌতুকে একটি নিশি কুষ্মাণ্ড রূপেই যাপন করলেন শিবের মালঞ্চে। কুষ্মাণ্ডারূপের তাৎপর্য হল বিবাহপূর্বা সুন্দরী কুমারীর সংযম। বিবাহের পর পার্বতীর একান্ত ইচ্ছা শিবের ঔরসে নিজগর্ভে পুত্র জন্ম। শিব জানতেন পার্বতী তাঁর তেজ ধারণ করতে পারবেন না। তবু তিনি মহামিলনে প্রবৃত্ত হলেন। সে রতিক্রীড়ায় ত্রিভুবন আকুল হয়ে ওঠে। দেবতারা জগতের কল্যাণের জন্য সেই মহামৈথুন ভঙ্গ করেন। অকাল মৈথুন ভঙ্গে যে বীর্য স্খলিত হয়, সেই বীর্য থেকেই জন্মগ্রহণ করেন কুমার স্কন্দ। শিবের স্খলিত বীর্যতেজকে প্রথম গ্রহণ করেন অগ্নিদেব। তিনি সে তেজ ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। গঙ্গা সে তেজ শরবনে ত্যাগ করেন। এই শরবনেই শিশুপুত্রের জন্ম হয়। কৃত্তিকাদি ছয় নক্ষত্রদেবী স্তন্য দিয়ে এই কুমারকে কিছুকাল পালন করে পার্বতীর ক্রোড়ে অর্পণ করেন। নবজাত শিশুর মাতা যেই হন, হরপার্বতীর সংশ্রয়ে শিবতেজ থেকে উৎপন্ন বলে পার্বতীকে বলা হয় 'স্কন্দমাতা'। চণ্ডীর গুপ্তবতী টীকায় বলা হয়েছে— যাঁর উদরে জন্মলাভ জ্ঞানীদেরও অভিলষণীয় অর্থাৎ যিনি অতি শুদ্ধা তিনি 'স্কন্দমাতা' নামে অভিহিতা।

এদেশে স্বামীই সাধ্বী স্ত্রীর একাশ্রয়। মনু বলেছেন, স্ত্রীলোকের পৃথকযজ্ঞ নেই, ব্রতও নেই। পতিনিষ্ঠ নারীই পৃথিবীতে পূজ্যতমা। রুদ্রের একান্ত অনুরাগিণী বলে দেবীর আর এক নাম রুদ্রাণী। শিবের মনোরঞ্জনই তাঁর ধ্যান জ্ঞান, সেজন্য তিনি শিবানী। পার্বতীর গার্হস্থ্যলীলার ভিতরে যা কিছু বিভূতির প্রকাশ দেখা যায়, সেগুলি সবই ঘটেছে কৈলাসে। কৈলাসবাসিনী শিবাণীই প্রয়োজন বিশেষে দানবদলনী। তিনি পরমাশক্তি। শিবশক্তি হলেও তাঁর শিবজায়া রূপটি আচ্ছন্ন হয়নি। দেবী সকলের হৃদয়স্থিত শুভকর মঙ্গলজনক অভিলাষিত ফলদান করেন বলে তাঁর নাম সর্বমঙ্গলা— 'সর্ব্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ। দদাতি ইপ্সিতাল্লোকে তেন সা সর্ব্বমঙ্গলা (দেবী পুরাণ ৩৭।১)'। দেবী ভক্তদের দুঃখ নিবারণ করেন এবং শ্রেষ্ঠ ফল দান করেন বলে তাঁর নাম মঙ্গল্যা— শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি যা দেবী দদতে হরে। ভক্তানামার্ত্তিহারিণী মঙ্গল্যা তেন সাদৃতা' (দেবী পুরাণ ৩৭।২)। সতীদক্ষজতনু ত্যাগ করে যখন মেনকাগর্ভে তখন দেব প্রয়োজনে ব্রহ্মা 'কালরাত্রি'কে স্তব করে বলেছিলেন, হে দেবি, তুমি তোমার কৃষ্ণবর্ণ দিয়ে মেনাগর্ভকে আবৃত কর, যাতে পার্বতী কৃষ্ণবর্ণা হন। কালরাত্রি তাই করেছিলেন। ফলে হিমালয়দুহিতার বর্ণ হয়েছিল নীলোৎপলদলশ্যাম। তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল কালী। হিমরাজ পার্বতীকে 'কালী' বলে ডাকতেন। শিবও পার্বতীকে কালী বলেই সম্বোধন করতেন। কালিকা পুরাণের বর্ণনায় একদিন হরপার্বতী যখন মন্দার পর্বতে বিহারে রত, তখন উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাদের সামনে শিব তাঁকে 'কালী কালী' বলে সম্বোধন করায় পার্বতী ক্রুদ্ধা হয়ে গৌরীত্ব লাভের জন্য তপস্যায় ব্রতী হলেন। গৌরবর্ণা হওয়ার জন্য পতিপ্রাণা

পার্বতী শিবেরই জ্যোতির্ময় শান্তরূপের ধ্যান করতে থাকেন— 'জ্যোতির্ময়ং পরং শান্তং শিবং শিবকরং বরম্'। তুষ্ট হয়ে যোগীশ্বর শিব পার্বতীকে ধ্যানেই দেখা দিলেন। আত্মতত্ত্ব বোঝাবার জন্য শিব প্রথমে কালীকে তাঁর কালিকাত্মিকা রূপ দেখিয়ে পরে পরাপ্রকৃতির নিষ্কন রূপ দেখালেন। অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি দিয়ে কালী তখন নিজের স্বরূপ বুঝতে পারলেন। বুঝলেন শিব হলেন জগন্ময় এবং তিনি নিজে হলেন জগন্ময়ী। বর্ণভেদ ভ্রান্তি মাত্র। স্বরূপে কালীই গৌরী, গৌরীই কালী। যিনি বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী, তিনিই ব্রাহ্মণী, সরস্বতী এবং তিনিই শিবানী কালী। ধ্যানে বিরত হয়ে পতির কাছে তিনি গৌরবর্ণ প্রার্থনা করলেন। আকাশগঙ্গায় স্নান করে কালী হলেন গৌরী। দেবীপুরাণ বলছে— দেবী যোগানলে স্বীয় তনু দগ্ধ করে পুনরায় হিমালয়ে জন্মগ্রহণ পূর্বক সূর্য ও পূর্ণচন্দ্র তুল্য প্রভাযুক্ত দেহ ধারণ করেন, এই জন্য তাঁর নাম গৌরী। মৎস্যপুরাণে রয়েছে অন্য কাহিনি। দেবীর কালরাত্রি নামের কারণ তিনি সর্ববিনাশক কালকেও নাশ করে থাকেন। প্রলয়ে কালেরও বিনাশ হয়ে থাকে। দেবী সকলকে মোক্ষ প্রদান করেন বলে তিনি সিদ্ধিদাত্রী। তিনি রজোগুণে ব্রাহ্মী শক্তিরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, সত্ত্বগুণে বৈষ্ণবী শক্তিরূপে পালন করেন এবং তমোগুণে মাহেশ্বরী শক্তিরূপে জগৎ সংহার করেন বলেই তিনি ত্রিগুণা। ত্রিপুরাতাপিনী উপনিষদে বলা হয়েছে— দেবী ভগবতী অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ বর্ণাত্মক মূর্তি দ্বারা সকল ভুবন, সর্বশাস্ত্র, সমুদয় ছন্দঃ ব্যাপী অবস্থান করছেন বলে তিনি শব্দাত্মিকা। ভক্ত রামপ্রসাদ এইজন্যই বলেছেন, 'যত শুন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে, কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।'

দেবী মহাবলপদ্ম নামক দৈত্যরাজকে জয় করেছিলেন বলে দেবীর নাম বিজয়া হয়েছে এবং সেই থেকে তিনি অপরাজিতা নামেও অভিহিতা হয়ে থাকেন। জীবের পাপ কর্ষণ বা বিনাশ করেন বলে দেবী কৃষ্ণা নামে খ্যাতা। কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে, দেবী অব্যক্তকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা বিভক্ত করে ব্যক্তরূপে প্রকাশিত করেন— এজন্য তাঁর বিষ্ণুমায়া নাম হয়েছে। দেবী কর্তৃক স্বয়ংশিব একবার দৌত্যকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই হেতু দেবীও শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। দেবী ভগবতীর সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বজাত ভেদ নেই। অদ্বিতীয়া রূপে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছেন, এজন্য তাঁকে বলা হয় 'একা'। আবার তিনি একা হলেও অনন্ত বিশ্বরূপে প্রকাশ পেয়ে

With Best Compliments from -

A

Well

Wisher

থাকেন, এজন্য তাঁকে 'নৈকা' অর্থাৎ অনেক স্বরূপা বলা হয়ে তাকে। দেবীর অম্বা নামটি বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলিত। যজুর্বেদের কাঠক সংহিতা পরতত্ত্বকে মা বলে সম্বোধন করেছেন 'অম্বা নামাসি।' শুক্ল যজুর্বেদে সর্বপ্রথম অম্বিকা নামটি পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় বলা হয়েছে— মা মাতা জননী সবই তুমি 'অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে।' দেবী পুরাণে বলা হয়েছে, দেবী ভগবতী নার অর্থাৎ জল বা নরসমূহের আশ্রয় কিংবা সমুদ্র তাঁর শয্যা, এজন্য তিনি 'নারায়ণী' নামে সমাখ্যাতা। লিঙ্গপুরাণে বলা হয়েছে, শিবের সহিত অভিন্ন বলে দেবী 'শিবা' নামে অভিহিতা। দেবীপুরাণ মতে চন্দ্র-সূর্য এবং অগ্নি দেবীর নেত্রত্রয় স্বরূপ, এজন্য মুনি-ঋষিরা দেবীকে ত্র্যম্বকা বলেন। অন্য স্থানে রয়েছে, ত্রি অম্ব অর্থাৎ অকার, উকার, ও মকার এই তিন বর্ণ যাঁর প্রতিপাদক, যিনি প্রণবপ্রতিপাদ্যা সেই দেবী ভগবতীই ত্র্যম্বকা নামে আরাধ্যা। স্মরণ মাত্রই যিনি বিষ, অগ্নি, ঘোর ভয় প্রভৃতি থেকে রক্ষা করেন তাঁর নাম 'শরণ্যা'। যিনি সমস্ত কার্যকারণের নিয়ন্ত্রী বা প্রেরয়িত্রী তিনি সর্বেশা। দেবী শতচক্ষুদ্বারা সাধু ব্যক্তিদের সবসময় নিরীক্ষণ করেন সেজন্য দেবীর নাম শতাক্ষী। যিনি শাক দ্বারা জীবগণকে পোষণ করেন তিনি শাকম্ভরী। ভ্রমরেরা দেবীকে বেষ্টন করে থাকেন বলে দেবীর নাম ভ্রামরী হয়েছে।

পার্বতীর ভিতর যে রুদ্রী শক্তি নিহিত ছিল তাঁর দেহ থেকে কৌশিকীর নির্গম তার প্রমাণ বহন করে। কৌশিকী কালরাত্রি। শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে তাঁরই ললাটফলক থেকে দংষ্ট্রাকরালবদনা কালী নির্গতা হয়েছিলেন। তিনি চামুণ্ডা নামেও বিখ্যাত। চণ্ডীতেও দেখা যায়, দেবীর দেহ থেকেই ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তি পৃথকভাবে প্রকাশ পেয়েছিলেন আবার দেবীর ইচ্ছাতে দেবীর দেহেই বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের নাম প্রসঙ্গে দেবী মাহাত্ম্যে স্বয়ং দেবী বলেছেন, সেইসময় শাকম্ভরী রূপে আমি যখন দুর্গম নামের মহাসুর বধ করব তখনই আমি দুর্গা নামে খ্যাত হব। হিমালয়ে কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে কৃষ্ণাদি আশ্বিনের কৃষ্ণচতুর্দশীতে দেবতাদের মিলিত তেজ হতে দশভুজা দুর্গার আবির্ভাব। দেবী কাত্যায়নের কন্যাত্ব স্বীকার করেছিলেন এজন্য দেবীর এক নাম কাত্যায়নী।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের একটি মন্ত্রে (১০।১।৬৫) দেবী দুর্গার প্রথম নামোল্লেখ রয়েছে। মন্ত্রটির ভাবার্থ এই— যিনি অগ্নিবর্ণা, যিনি তপস্যার দ্বারা জ্যোতির্ময়ী, যিনি বৈরোচনী কর্মফলের নিমিত্ত উপাসিতা সেই দুর্গা দেবীর শরণ নিলাম। দুর্গাকে বলা হয়েছে বৈরোচনী। বিরোচন শব্দের অর্থ সূর্য বা অগ্নি। তেজঃ অর্থাৎ অগ্নি থেকে উৎপন্না বলে তিনি বৈরোচনী। দেবী অনন্তনয়না তাই তিনি শতাক্ষী। তিনি জীবসকলকে ধর্ম, অর্থস কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সর্বার্থ প্রদান করেন, তাই তাঁর নাম সর্বকামার্থসাধিনী। তাঁর শরণ নিলেই তিনি প্রাণীদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তাই তাঁর এক নাম শারণ্যা। সকল স্থানেই তাঁর জয় হয় বলে তিনি জয়ন্তী। কল্পের অবসানে সিংহাসীনা হয়ে তিনি মহিষাসুরকে নিধন করেছিলেন বলে তাঁর নাম মহিষঘ্নী। দেবগণের উপকারের জন্য তিনি রুরু নামক মহাসুরকে বধ করে, তার চর্ম ও মুণ্ড বাম হস্তে ধারণ করেছিলেন বলে তিনি চামুণ্ডা। দেবলোকে নন্দনকাননে সর্বদা বাস করেন এবং হিমাচলে বাস করে আনন্দ লাভ করেন— তাই তাঁর নাম নন্দা। সামান্য আরাধনাতেই সন্তুষ্টা হয়ে সকলকে সুখপ্রদান করেন বলে তাঁর নাম সুখপ্রদা। মহাভাব আশ্রয় করে শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বলরূপধর মহাদেবকে আশ্রয় করে আছেন বলে তিনি মহাশ্বেতা নামে পরিচিতা। তিনি দুন্দুভিধ্বনির ন্যায় আনন্দদায়ক তাই তাঁর নাম নন্দিনী। দেবগণের ঈশ্বরী বলে তিনি ত্রিদশেশ্বরী নামে খ্যাত। ভব শব্দে রুদ্র, সংসার এবং কাম এই তিন নির্দেশ করে। তিনি এই সমুদয় সৃজন করেন তাই তিনি ভবানী। সকল প্রকার তমঃ বিনাশ করেন বলে তিনি তমোনাশিনী। সর্বকালেই বিরাজমানা এবং মাতারও অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তিনি জ্যেষ্ঠা। তিনি সর্বকালের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয়া, তাই তিনি গায়ত্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতারও তিনি লয়সাধন করে থাকেন বলে তাঁর নাম শঙ্করী। তিনি শান্তিস্বরূপা বলে শান্তি। সকল ভক্তকে নিখিলভয় হতে ত্রাণ করেন বলে তিনি তারিণী। বাম শব্দে বিরুদ্ধ ভাব বোঝায়, দেবী বিরুদ্ধ বা বিপরীতাচারীকেও সুখপ্রদান করেন বলে বামা। ভক্তগণের হৃদয়মধ্যে তিনি চৈতন্যরূপে বিরাজ করেন তাই তিনি চৈতন্যময়ী। সুরাসুরগণ সকলেই তাঁর পুজো করেন এবং তাঁর শরীরও অতি মহৎ তাই তাঁর নাম মহাদেবী। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে দেবী আদ্যাশক্তি বিপ্রচিত্তি দানবের বংশধরদের বধ করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে ঐ দানবদের ভক্ষণ করেন, তখন তাঁর দন্তসমূহ দাড়িমকুসুমসদৃশ রক্তবর্ণ হয়েছিল বলে স্বর্গস্থ দেবতারা তাঁকে রক্তদন্তিকা নামে স্তব করেছিলেন।

শ্রীভাস্কর রায় চণ্ডীর গুপ্তবতী টীকাতে বলেছেন, ভগবতী চণ্ডিকা মধুপান দ্বারা রাজসী মহালক্ষ্মী মূর্তি ধারণপূর্বক ঐ মূর্তিতেই মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলেই দেবীর নাম মহিষাসুরমর্দিনী। পার্বতীর সঙ্গে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার যোগ কিরূপে সম্ভব? বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ঐতিহাসিক বিচারে হিমালয়ের উমা ও কাত্যায়নী দুর্গা স্বতন্ত্র। যদিও চণ্ডী সপ্তশতীতে দেবী নিজেই বলেছেন দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে তিনি আবির্ভূতা হন। আর বামনপুরাণের মতে, মহিষাসুরকে বধ করে দেবতাদের বর দিয়ে দেবী হরপাদমূলেই প্রবেশ করেছিলেন।■

মিতবা
নতুন যুগ নতুন আলো

সৌর শক্তি চালিত

৯ ঘন্টা পর্যন্ত আলো প্রতিদিন
(পুরোপুরি চার্জ হলে)

এখন আপনিও হতে পারেন
সম্মানজনক রোজগারের অধিকারি

RAL আপনাকে দিচ্ছে এক সুবর্ণ সুযোগ যাতে আপনি তাদের বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে পেতে পারেন **নিয়মিত কমিশন**। ইচ্ছুক বেসরকারি সংস্থা (NGO), স্টকিস্ট এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরাও আমাদের ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারেন।

আরও বেশী জানতে হলে

- ফোনে 1 টাইপ করে 09711361069 নং-এ SMS করুন
- অথবা 09748737867 নং-এ কল করুন

www.beiconfluence.net/ral/688/2014

ZAP | GLIDE™ | Purple Turtle Child Care Products | NIPPO

RAL
Global brands. Built on trust.

রেডিয়াম্‌স এজেন্সী লিমিটেড
B - 7/2 ওখলা ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এরিয়া, ফেজ - 2, নতুন দিল্লী - 110020, ফোন নং. 011-40500800
P-17 মিশন রো ক্রপ্‌টেনসন্‌, কলকাতা-700013, ফোন নং. 033-6540-6399
ই-মেল : info@ral.co.in, ওয়েবসাইট : www.ral.co.in

দুর্গা : রাষ্ট্র পরিকল্পনার নিখুঁত ছবি

বরুণ দাস

কথায় বলে, সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। সত্যিই তো দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেল, রাজা কিংবা জমিদারদের নাটমন্দির থেকে মা দুর্গা এসেছেন বারোয়ারি মঞ্চে। সাধারণ মানুষের আন্তরিক আগ্রহে মা দুর্গা হয়েছেন সর্বজনীন। আর সন্তানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-দলাদলিতে মা দুর্গা এখন বাধ্য হচ্ছেন একই পাড়ার একাধিক মঞ্চে পা রাখতে। একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, আমাদের পুজো-পার্বণ ও উৎসব এখন নানাভাবে গ্লানিগ্রস্ত। সবই কেমন যেন অর্থহীন গতানুগতিক গড্ডলিকাপ্রবাহে পরিণত। আরাধ্য দেবদেবীর তত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলা অত্যুক্তি নয়। আর এই অজ্ঞতার জন্যই আমাদের পুজো-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠান কেবল মাতন আর হুল্লোড়ে পর্যবসিত। তাই অজ্ঞতার আবরণ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে গতানুগতিকতার পরিবর্তে পুজো-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিকে আরও বেশি করে সদর্থক ও প্রাণস্পন্দন করে তোলা দরকার।

শাস্ত্রবচনে বলা হয়েছে, 'দ' শব্দটি দৈত্যনাশক, 'উ'-কার বিঘ্ননাশক, 'রেফ্' রোগঘ্ন, 'গ'-কার পাপঘ্ন এবং 'আ'কার ভয়শত্রুঘ্ন— দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ এবং ভয় ও শত্রু হতে যিনি রক্ষা করেন তিনি দুর্গা। মতান্তরে 'দুগ' শব্দটি দৈত্যবাচক এবং 'আ'কার নাশবাচক, যিনি দুর্গ নামক অসুরকে নাশ করেন তিনিই নিত্যদুর্গা নামে প্রকীর্ত্তিক। 'দুর্গ' শব্দটি আবার বিপত্তিবাচক, 'আ'কার নাশবাচক, যিনি বিপত্তারিণী— তাঁকেই দুর্গা নামে অভিহিত করেন জ্ঞানীরা।

স্কন্দপুরাণে পাই, রুরুদৈত্যের পুত্র দুর্গাসুরকে বধ করায় দেবী বিশ্বলোকে পরিচিতা হয়েছেন দুর্গা নামে। শরণাগত দেবগণের প্রার্থনায় দেবাদিদেব শঙ্করের নিয়োগক্রমে দেবী দুর্গা ওই অসুরকে বধ করেছিলেন। আবার শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী বলেছেন, 'তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্ / দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।' অর্থাৎ দুর্গম নামক মহাসুরকে বিনাশ করে আমি প্রসিদ্ধা হব দুর্গাদেবী নামে।

হ্যাঁ, দুর্গম এক মহাসুরই বটে। এ অসুরের উপদ্রবে মানুষ মাত্রই পরাভূত। অজ্ঞানতাবশত বারবার সংসারে এসে মানুষ ভোগ করে অশেষ দুঃখ-দুর্গতি। জ্ঞানরূপ আয়ুধে দেবী সে অসুরকে বধ করলে তবেই মানুষের মুক্তি, তার জন্ম-জন্মান্তরের অবসান।

দুর্গা আসলে কী? যিনি দুর্গার ব্যাকরণগত অর্থ জানেন, তিনি হয়তো চটজলদি শব্দের মূলে গিয়ে বলবেন, দেবীর তত্ত্ব অতি অগম্য বা দুর্জ্ঞেয় তাই তিনি দুর্গা। দুর + গম্ (কর্মবাচ্যে) + ড (স্ত্রী লিঙ্গে) আপ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয় দুর্গা শব্দটি। না, দুর্গা নিয়ে নবদ্বীপের নৈয়ায়িকদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে আমরা বরং দেখি বৈদিক সূক্তে দেবী নিজেই কি বলেছেন। 'অহং রাষ্ট্রী'। আমি এই বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বরী। দেবীমূর্তির মধ্যে রাষ্ট্র পরিকল্পনার এই নিখুঁত ছবিটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিঃসন্দেহে।

বলা বাহুল্য, জাতি গঠনে চার শ্রেণীর মানুষ প্রয়োজন। এঁরা হলেন বুদ্ধিজীবী, বীর্যজীবী, বৃত্তিজীবী ও শ্রমজীবী। বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত জাতি বা রাষ্ট্রের পরিচালক বা কর্ণধার। রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র তাদেরই হাতে রচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ দেশের শিক্ষা সমৃদ্ধির নানাবিধ পরিকল্পনা তাঁরাই করেন। বীর্যজীবীরা তাদের বাহুবল ও আত্মত্যাগ দ্বারা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করেন। বৃত্তিজীবীরা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও পশুপালনের মাধ্যমে ধনোৎপাদন করে দেশের সমৃদ্ধির কাজ করেন। আর শ্রমজীবীরা প্রথম তিন শ্রেণীর অধীনে শ্রমের দ্বারা দেশের সার্বিক উন্নতি বিধানে সহায়ক হন। এদের মূলধন হলো নিজেদের জন্মলব্ধ শরীর।

এই চার শক্তিকেই অন্যভাবে বলা হয়— জ্ঞানশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, ধনশক্তি আর জনশক্তি। এবং এর একটির অভাব হলেই যে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। ভারতবর্ষের জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের কল্পনায় এই চার শক্তির স্থান প্রাচীনকালেই নির্ধারিত হয়েছিল একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রভাবনা থেকেই এ দেশে সৃষ্টি হয়েছিল চাতুর্বর্ণ বিভাগ— ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। যদিও আধুনিককালে এই 'ভেদাত্মক' বিভাগ আমাদের জাতীয় জীবনে এনেছে বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড়।

দুর্গাদেবীর দক্ষিণে বা ডানদিকে লক্ষ্মী ও গণেশ এবং বাঁদিকে সরস্বতী ও কার্তিক। লক্ষ্মী ধনশক্তি বা বৈশ্যশক্তি, গণেশ গণশক্তি বা শূদ্রশক্তি তথা শ্রমশক্তি, সরস্বতী জ্ঞানশক্তি বা ব্রহ্মণ্যশক্তি এবং কার্তিক ক্ষাত্রশক্তির অধিদেবতা। সুতরাং দুর্গার সামগ্রিক রূপ মানেই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় জ্ঞান বা রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান। আর এজন্যই দুর্গা প্রতিমা আসলে বৃহত্তর অর্থে আমাদের জাতিপ্রতিমা। এ সত্যটি অনুধাবন করেই বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছিলেন 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত। সাহিত্য সম্রাটের সেই দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের অমূর্ত মূর্চ্ছনা ও মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়েছিল ভারতবাসী, প্রাণিত হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে একথা আমাদের সবারই কমবেশি জানা।

অন্যদিকে দুর্গার আরাধনা আধ্যাত্মিকতারও অন্যতম দিক। দেবীর পায়ের নীচের সিংহ রাজোগুণের এবং সিংহাক্রান্ত অসুর তমোগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণময়ী দুর্গা নিয়ন্ত্রিত করছেন রাজোগুণের দ্যোতক সিংহকে এবং সিংহ শাসন করছে তমোগুণাত্মক মহাসুরকে। এক কথায় বলা যায়, দেবীর সঙ্গে অসুরের সংগ্রাম বস্তুত দৈবীভাবের সঙ্গে আসুরিকতার সংগ্রাম। এমন দেবাসুর সংগ্রাম আমাদের অন্তর্লোকেও অহর্নিশ চলছে এবং এর থেকে মুক্তি অর্জনের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে দুর্গাদেবীর মধ্যে। সুতরাং দুর্গাপুজোর মধ্য দিয়ে আত্মিক মহাশক্তির অর্জনই আমাদের পরম কাম্য হতে পারে।

দুর্গাপুজো সংহতিসাধনারও অন্যতম প্রতীক। কারণ দুর্গা অদ্বৈত-তত্ত্বময়ী। পরম অদ্বৈততত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে অখণ্ড ঐক্যের মূর্ত ভাবনা। সুতরাং দেবী সমষ্টি শক্তিরূপিণীও বটে। দেবীর তত্ত্ব ও তাঁর মহাপ্রকাশ তথা দেবীর দিব্যলীলার মধ্যে সেই সংহতি সাধনার স্বরূপ উজ্জ্বল। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বিপন্মুক্ত দেবগণ 'নিঃশেষ দেবগণশক্তিসমূহ মূর্তে' বলে স্তুতি করেছেন দুর্গার। তাঁর মধ্যে দেবগণ নিজেদের সমষ্টিগত স্বরূপ উপলব্ধি করেই দেবীর আরাধনা করেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। দুর্গাপুজোর মাধ্যমে সমাজোন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ চিন্তাও লক্ষ্য করা যায়। দশভুজা দেবীর মূর্তির মধ্যে যেমন, তাঁর পুজোর ক্রম ও উপাচারেও তেমনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্পৃক্তির চিত্র স্পষ্ট। ব্রাহ্মণ, মালী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, নরসুন্দর, সভাসুন্দর, ঋষিদাস এমনকী বারবাণিতা— সব মানুষেরই বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত দেবীর মহাপুজোয়। এর মধ্যে দিয়ে জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা পূর্ণতা পেয়েছে একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

সুতরাং দুর্গোৎসবের পুণ্যলগ্নে আমাদের সম্মিলিতভাবে অনুধাবন করা দরকার মা দুর্গার বহুমুখী বৈশিষ্ট্যগুলিকে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে এনে দিতে পারে এক অপার মাধুর্য, করে তুলতে পারে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর। আজি শারদপ্রাতে এই হোক আমাদের একমাত্র কামনা।

ঋণস্বীকার :

দেবদেবী ও তাঁদের বাহন : স্বামী নির্মলানন্দ

সঙ্ঘ-সাধনা ও তার সমালোচকরা

রমেশ পতঙ্গে

গত লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণা থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রয়োজনের অধিক আলোচনার বিষয় হয়েছে। সঙ্ঘের সমালোচকরা বলতে ও লিখতে শুরু করেন যে, এখন নরেন্দ্র মোদীর সরকার নাগপুর থেকে রিমোট কন্ট্রোল চলবে। নাগপুর সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় এবং সরসঙ্ঘচালকের পত্র ব্যবহারের ঠিকানাও বটে। কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠিত হওয়ার পর কিছু লোক সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেন, কিছু লোক ভাল ভাল কথাও বলতে শুরু করেন। সঙ্ঘের আলোচনা ও সমালোচনা এত বেশি চলছে তাই সঙ্ঘ কি— এটা জানাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই লেখার মাধ্যমে সেই প্রয়াস করা হচ্ছে।

সমালোচক

সঙ্ঘের বিষয়ে একটি মজার কথা যে, সঙ্ঘের ব্যাখ্যা সঙ্ঘ-সমালোচকরাই করছেন এবং সেইমতো মনগড়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে মত ব্যক্ত করছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা ও মত হলো, সঙ্ঘ খুবই বিপজ্জনক সংগঠন; মোদীর মাধ্যমে ভারতের রাজনীতির রাশ একপ্রকার সঙ্ঘের হাতে এসে গেছে এবং এর অপব্যবহার হতে থাকবে ইত্যাদি। এখন পর্যন্ত এরকম ব্যাখ্যাই সামনে এসেছে এবং আরও আসতে থাকবে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটিই সিদ্ধান্ত মান্যকারী সংগঠন। সঙ্ঘের মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত আর নেই। তা হলো 'এই রাষ্ট্র হিন্দু রাষ্ট্র'। এর একটা উপসিদ্ধান্ত হলো 'হিন্দু সমাজ এই দেশের রাষ্ট্রীয় সমাজ'। এই সমাজ নানা ভাষা, পন্থ ও প্রদেশে বিভক্ত। সঙ্কুচিত স্বার্থের কারণে নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ভুলে গেছে। সঙ্ঘের কাজ প্রত্যেক হিন্দুর মনে এই ভাব নির্মাণ করতে করা— আমি প্রথমে হিন্দু, রাষ্ট্রের আমি একটি অঙ্গ, এই সমাজের আমি একটি অঙ্গ। এই কাজ শুধু ভাষণ দিয়ে, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে বা গ্রন্থপাঠে হবে না। এর জন্য প্রত্যেক হিন্দুর মনে নিত্য সংস্কার হওয়া জরুরি। এই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘের শাখা চলে। সঙ্ঘের কাজ এই শাখার দ্বারাই চলছে।

হাস্যাস্পদ ভাবনা

সঙ্ঘের কাজ উপলব্ধি করা খুবই সহজ। এখানে শুধু বৌদ্ধিক কচকচি নেই, আলোচনার মধ্যে কোনো গভীরতা নেই। এজন্য অনেক লোকের সঙ্ঘের কাজকে হাস্যাস্পদ ও বালখিল্য মনে হয়। সেজন্য স্বয়ংসেবকদের তারা 'হাফ গান্ডু' বলে উপহাস করে। যাঁরা নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবেন, শিক্ষিত ভাবেন, নানা তত্ত্বজ্ঞানের পড়াশুনা করা লোক ভাবেন, তাঁরা সঙ্ঘের মতাদর্শকে কাটাছেঁড়া করতে শুরু করেন। কিন্তু তাদের বুদ্ধির প্রখরতা তাদের ভাবনাকে হাস্যাস্পদ করে তোলে। তাঁদের তর্ক ও বুদ্ধির কিছু উদাহরণ দেখার মতো হয়। হিন্দুরাষ্ট্র ধারণার প্রধান বিরোধী কমিউনিস্ট ভাবধারার পণ্ডিতরা। অমর্ত্য সেন, রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব প্রমুখ নাম শিক্ষাজগতে প্রসিদ্ধ। তাঁরা অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন। এই ভাবধারার তপন বসু, সুমিত সরকার, প্রদীপ দত্ত, তনিকা সরকার ও সম্বুদ্ধ সেন 'খাকি সর্টস্ অ্যান্ড সেফ্রন ফ্ল্যাগ' নামে একটি বই লিখেছেন। অমর্ত্য সেন 'হিন্দুত্ব

মুভমেন্ট অ্যাণ্ড রিইনভেনটিং অব হিস্ট্রি' বই লিখেছেন। লিটিল ম্যাগাজিনে 'দ্যা নেশন দ্যাট ইজ ইণ্ডিয়া' শীর্ষকে ইরফান হাবিব একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এসব বিষয়ে উত্তর দেওয়া এই ছোট প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাঁদের বক্তব্যের মূল কথা বুঝতে হবে।

অমর্ত্য সেন লিখেছেন, "Through their attempts to encourage and exploit separatism, the Hindutva movement has entered into a confrontation with the idea of India itself. This is nothing short of a sustained effort to miniaturize the board idea of a large India proud of its heterodox past and its pluralist present and to replace it by the stamp of a downsized version of Hinduism"।

এর ভাবার্থ হল, হিন্দুত্ব আন্দোলনের সংঘর্ষই ভারতের নামের মধ্যে আছে। এ সমস্ত প্রচেষ্টা ভারতকে লঘু করার জন্যই। ভারতের বিবিধতাকে ধ্বংস করে তাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টা। এই সংঘর্ষ এক বিশাল ভারত এবং ক্ষুদ্র ভারতের।

'খাকি সর্টস্ অ্যাণ্ড সেফ্রন ফ্ল্যাগ' লিখেছে, "The primary and most paradoxical being the fact that the RSS and its affiliates trumpet Hinduism over other religious for its essential tolarence, professing its internal catholicity, but combine it with complete intolarance for other religious. The tolarance flounders even within the RSS where rigid discipline, unquestioning obedience and the absence of any organisational democracy are the norm"।

ভাবার্থ হলো, সঙ্ঘ এটা বলে যে, অন্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম শ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্মকে সঙ্ঘ সহিষ্ণুধর্ম বলে এবং অন্য ধর্মের প্রতি তারা অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে।

ইরফান হাবিব-এর বক্তব্য— 'সঙ্ঘে কঠোর অনুশাসন আছে। আজ্ঞাপালনকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোনো প্রকার গণতন্ত্র নেই। নেশন বা রাষ্ট্রের অবধারণা তো সেদিনের। ইংরেজ এদেশে আসার পর রাষ্ট্র কল্পনা বিকশিত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় গান্ধীজীর মনে হয়েছিল ভারত সমস্ত ধর্মের দেশ। হিন্দু রাষ্ট্রীয়তার কারণে সেই ভাব নষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হিন্দুরাষ্ট্র ধারণা ও মুসলমানদের মুসলিম রাষ্ট্রবাদের কারণে ভারত প্রথমে দুই এবং পরে তিন টুকরো হয়েছে। হিন্দুত্বের

ভাবনা দেশকে বিচ্ছিন্ন করার ভাবনা — "Now that over fifty years have passed since partition it would be foolish not to recognise that the limits of the Indian nation, for good or ill Pakistan and Bangladesh are realities; and there can be no more irresponsible a cry than Akhand Bharat (undivided India), raised a new by the very elements whose clooked two-nation theory contributed so much to the partition"।

এর ভাবার্থ হলো— পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতার পর ইণ্ডিয়ান নেশন-এর পূর্ণ ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসেবে মান্যতা দেওয়া উচিত। এই সময়ে অখণ্ড ভারতের স্লোগান দায়িত্বহীন কাজ। যে লোকেরা দুটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে তারাই অখণ্ড রাষ্ট্রের স্লোগান দিচ্ছে।

সঙ্ঘ হিন্দুরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করেছে। হিন্দু রাষ্ট্রের অর্থ সমালোচকরা নিজের মতো করে করেছেন। অধিকাংশ লোক এর অর্থ ধর্মবাচক করেছেন। তাঁরা মনে করেন, হিন্দুধর্ম পালনকারীরাই হিন্দু, আর এই হিন্দুদের দেশই হিন্দুরাষ্ট্র। অর্থাৎ ধর্মীয় রাষ্ট্র। ধর্মীয় রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক রূপে থাকবে। তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হবে। কিন্তু সমালোচকরা জানেন না, যে 'হিন্দু' শব্দ কোনো ধর্মবাচক শব্দই নয়। অমর্ত্য সেন, ইরফান হাবিব এবং বামপন্থী তাত্ত্বিকরা খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মের মতোই 'হিন্দু' শব্দকে ধর্মবাচক মনে করেন। খৃস্টান ও ইসলাম রিলিজিয়ন বা উপাসনা পদ্ধতি। রিলিজিয়ানের অর্থ ধর্ম নয়। তাই হিন্দু কোনোভাবেই রিলিজিয়ন নয়। রিলিজিয়নের জন্য একজন পয়গম্বর বা দূত, একটি গ্রন্থ, এক ঈশ্বর এবং একইরকম উপাসনা পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। যে বিবিধতার কথা অমর্ত্য সেন বলেন, সেই 'প্লুরেলিটি' যে কোনো রিলিজিয়নে থাকা অসম্ভব। সেজন্য খৃস্টান দেশে তাদের মতাবলম্বী চার্চ ছাড়া অন্য চার্চের লোকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়। ইসলামে যে পন্থ (শিয়া, সুন্নি, ওয়াহবি, খোজা, মোমিন ইত্যাদি) ক্ষমতায় থাকবে তারা ছাড়া বাকি সবাই কাফের। নোবেল জয়ী পণ্ডিতের ইতিহাসের এটুকু জ্ঞান তো থাকা উচিত!

হিন্দুজীবন পদ্ধতি

সঙ্ঘ হিন্দু শব্দের প্রয়োগ রিলিজিয়ন অর্থে করে না। হিন্দু এক জীবনপদ্ধতি। শ্বাশত ও সনাতন এবং বহু হাজার বছরের পুরনো। এই জীবনপদ্ধতি বিশ্বচরাচরের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ অনুভব করে। প্রত্যেকের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। এখানে প্রত্যেকের নিজ নিজ রুচি অনুসারে উপাসনা করার স্বাধীনতা আছে। এই জীবনধারা নিজ নিজ বিশেষত্বকে বিকশিত করার আহ্বান জানায়। আমরা সবাইকে উন্নত করতে চাই। সাধারণ থেকে অসাধারণ মানুষ হতে চাই। তার পথ হলো সৎকর্ম করা। সবাইকে নিজের মধ্যে উত্তম গুণ বিকাশিত করার প্রয়াস করতে হবে। চরিত্রবান, বিনয়, সত্যবাদিতা, অহিংসা, আক্রোশ ইত্যাদি গুণের অনুশীলন করতে হবে। যে রকম আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে সেরকম সৃষ্টির সমস্ত প্রার্থীরই আছে। তাই সবাইকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। একেই হিন্দু জীবনপদ্ধতি বলা হয়। অমর্ত্য সেন, ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার প্রমুখ উন্নত চিন্তা করতে পারেন, কেননা তাঁরা হিন্দু। হাবিব সাহেবের ধমনীতে হিন্দুরক্তই বইছে। খৃস্টানরা Clash of civilisation-এর কথা বলেন, হিন্দুরা এভাবে ভাবতে পারেন না।

এটা হিন্দুরাষ্ট্র— এর অর্থ হলো আমাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতি আছে। এই জীবনপদ্ধতি ও সংস্কৃতির কারণেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত। অমর্ত্য সেন ও ইরফান হাবিবের সম্ভবত জানা নেই যে, পাকিস্তানের কিছু লোক বলেন, বালুচিস্তান থেকে বাংলাদেশ এক দেশ। এটাই ভারতীয় ভাবনা। রজা হাবিব রাজা একজন পাকিস্তানি বিদ্বান। তিনি বলেন, আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিতে অবশ্যই পাকিস্তানি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি একজন পাকিস্তানি

ভারতীয়। ভারতীয়ত্বের এই ধারণা যে কোনো রিলিজিয়ানের থেকে অনেক বড়। কোনো ব্যক্তির মুসলমান বা খৃস্টান হওয়া এবং হিন্দুরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হওয়া— এই দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। সংঘর্ষ তখন শুরু হয় যখন ভারতীয়ত্বের ধারণাকে রিলিজিয়নের ছাঁচে ফেলে বিরোধিতা করা হয়। ভারতীয়ত্বের ধারণাকে এই ফ্যানাটিজমে প্রতারণা করা হয় এবং এর থেকে বড় প্রতারিত হন ভারতের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা এটা বুঝতেই পারেন না।

সঙ্ঘ সাধনা

সঙ্ঘের কাজ হলো, হিন্দু জীবনপদ্ধতিকে কায়েম রেখে, তাতে কালানুরূপ পরিবর্তন করে অধিক সামর্থ্যশালী করা। এই পরিবর্তন ব্যক্তি ব্যক্তিকে সংস্কার করেই করতে হবে। সংস্কার প্রতিদিনি করতে হয়। তাহলেই তা স্বভাবে পরিণত হয়ে আচরণে আসবে। এটাকেই সঙ্ঘসাধনা বলা হয়। সাধনা সতত করতে হয়, প্রতিক্ষণ করতে হয়। এর জন্য কিছু ব্রত পালন করতে হয়। আমাদের ভাষায় 'সাধনা' এমন একটি শব্দ যার ইংরেজিতে কোনো প্রতিশব্দ নেই। সাধনার ইংরেজি প্র্যাকটিস অথবা পারপেচুয়াল ওয়ার্ক নয়। সাধনার অর্থ সাধনাই।

পতঞ্জলি যোগসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় হলো সাধনাপাদ। এতে ঋষি পতঞ্জলি যোগ সাধনার জন্য কী কী করতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। যদি যোগের সর্বোচ্চ ফল অর্থাৎ সমাধি প্রাপ্ত করতে হয়, তবে তার জন্য যম-নিয়মাদি কঠোরভাবে পালন করা আবশ্যক। ঋষি পতঞ্জলি সাধনাপাদে বলেছেন—

যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম প্রত্যাহারধারণাধ্যন সমাধয়ো হরা বঙ্গানি।।২৯

অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের অষ্ট অঙ্গ।

অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মাচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।। ৩০

অর্থাৎ হিংসা না করা, সত্যবাদিতা, চুরি না করা এবং অপরিগ্রহ ইত্যাদিকে যম বলা হয়।

এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিনাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্।। ৩১

অর্থাৎ এই কথাকে (যম) স্থান, কাল, হেতু এবং জাতির নিয়মের প্রভাব ব্যতীত অখণ্ডরূপে নিয়মিত অনুশীলন করে যাওয়াকেই 'সার্বভৌম মহাব্রত' বলা হয়। ব্যাখ্যা : অহিংসা, সত্য, অস্ত্রেয়, ব্রহ্মাচর্য এবং অপরিগ্রহ এই ব্রত প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা ও শিশু অর্থাৎ সবারই পালন করা উচিত। তা সে যে কোনো জাতির, রাষ্ট্রের এবং যে কোনো অবস্থাতেই হোক না কেন।

শৌচসান্তাষপঃ সাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মা।। ৩২

অর্থাৎ অন্তর-বাহ্য শুচিতা, সমাধান, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরের উপাসনা— এ সমস্ত নিয়ম। ব্যাখ্যা : অন্তঃশুদ্ধ অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ থাকা। বাহ্যশুদ্ধ হলো শরীর নির্মল রাখা। পতঞ্জলি ঋষির মতে, উপরোক্ত সমস্ত ব্রত সার্বভৌম। সার্বভৌমের কোনো বিকল্প অর্থ নেই— স্বয়ংসিদ্ধ। এই ব্রত দেশ, কাল ও পরিস্থিতির বাধ্য নয়।

সামর্থ্যের অর্থ :

সঙ্ঘ হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণা উপলব্ধি করে সমাজকে হিন্দু সংগঠনের মন্ত্র দিয়েছে। সংগঠনে তন্ত্র বা পদ্ধতি বিকশিত করেছে এবং ব্যবহারে আসার জন্য সাধনার পথ দেখিয়েছে। ঋষি পতঞ্জলির ভাষায় বলা যায়, তো এই সাধনাও সার্বভৌম। এরও যম-নিয়ম আছে। এই যম-নিয়মগুলি বোঝার আগে সাধনার মাধ্যমে সঙ্ঘ কী চায় তা বোঝাও খুব জরুরি।

হিন্দুরাষ্ট্রকে শক্তিসম্পন্ন করার জন্য সঙ্ঘ-সাধনা চলছে। শক্তিশালী রাষ্ট্র বলতে আমরা কি বুঝি? কোনো রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেই কী সেই রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়? শুধুমাত্র সেনাবাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্রের ভিত্তিতে কোনো রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না। যদি এরকম হতো তাহলে ১৯৯০ সালে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র ভেঙে পড়তো না। তখন রাশিয়া মহাশক্তিধর দেশ। পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো পারমাণবিক অস্ত্র তাদের হাতে আছে। তা সত্ত্বেও সে দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরকম শক্তিধর দেশ আমেরিকাও। কিন্তু সে ভিয়েতনামের মতো একটা ছোট্ট রাষ্ট্রকে পরাজিত করতে পারেনি। রাষ্ট্রের আসল শক্তি সেই রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে থাকে। এই শক্তি সেই দেশের রাষ্ট্রীয় জনতার মনোবলের মধ্যে নিহিত থাকে। মনোবল ভাবাত্মক হয়। আমরা এক রাষ্ট্র। আমাদের এক জীবনপদ্ধতি, এক ইতিহাস। আমাদের কিছু জীবনমূল্য আছে। তার তত্ত্বজ্ঞান, তার জীবনপদ্ধতি নিয়মিত স্মরণ করানো খুবই প্রয়োজন। এই ভাবনায় ওতপ্রোত কার্যকর্তা নির্মাণ করা জরুরি। কেবল উপদেশ ও ভাষণে এই কাজ হবে না। লোকের সামনে রাষ্ট্রীয় ভাবনায় ওতপ্রোত ব্যক্তিকে আদর্শ হিসেবে রাখতে হয়। এরকম জীবনাদর্শে নির্মাণ করাই সঙ্ঘ-সাধনা।

এই সাধনার যম-নিয়ম সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করার পর সর্বপ্রথম একথাই মনে আসে যে, এটাই সঙ্ঘ-সাধনা এবং এই কাজ ঈশ্বরীয় কাজ। সেজন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সাধনা করতে হয়। সঙ্ঘকাজ ঈশ্বরীয় কাজ হওয়ার কারণে শুদ্ধ ও পবিত্র। অপবিত্র কাজ কখনো ঈশ্বরীয় কাজ হতে পারে না। সঙ্ঘে ঈশ্বরের অর্থ হলো এই বিশ্বকে সঞ্চালনকারী আদি শক্তি। সঙ্ঘকাজ এই আদি শক্তিরই। এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সঙ্ঘ-সাধনার প্রথম যম-নিয়ম।

সঙ্ঘের কাজ ঈশ্বরীয় হওয়ায় তা সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের কাজ। কোনো বিশেষ জনসমুদায় অথবা জাতিগোষ্ঠীর

কল্যাণের কাজ নয়। হিন্দুজীবন পদ্ধতি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকারী জীবনপদ্ধতি। এই জীবনপদ্ধতিতে ব্যক্তি একা নয়, পরস্পরের সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত। অভিন্ন হওয়ার জন্য আমরা সবার কথা ভাবি। মানুষ স্বভাবতই পরাবলম্বী, সেজন্য পরস্পর সংঘর্ষ করতে পারে না। পরস্পর সমন্বয় সাধন করে বেঁচে থাকতে হয়। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি মনে রাখে। এই ভাবনাই সঙ্ঘকাজের যম-নিয়ম।

রাষ্ট্র-সাধনার কাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবনার সঙ্গে করতে হয়। মনে কোনো প্রকার স্বার্থের লেশমাত্র থাকলে হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির ধন, প্রসিদ্ধি ও পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। সার্বজনিক কাজ করার সময় তা থেকে ধন, প্রসিদ্ধি ও হাততালির বড় লোভ থাকে। সঙ্ঘের রাষ্ট্র-সাধনার কাজ মনে এরকম কোনো ভাবনা নিয়ে করা যায় না। সঙ্ঘকাজ করার সময় ধনলাভের কোনো স্থানই থাকে না। প্রসিদ্ধি তো পাওয়াই যায় না এবং পদপ্রাপ্তিও অধিকার না হয়ে দায়িত্ব পালন করার কর্তব্য বা সুযোগ বলে মনে করা হয়। সঙ্ঘসাধনা করার সময় এরকম নিঃস্বার্থ ভাবনা সহজেই নির্মাণ হয়ে যায়। যিনি এই ভাবনায় জারিত হতে পারেন না তিনি আপনা হতেই সঙ্ঘকাজের বাইরে চলে যান। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবনা সঙ্ঘকাজের অতি গুরুত্বপূর্ণ যম-নিয়ম।

সঙ্ঘসাধনা সেবা-সাধনাও বটে। কার সেবা? দেশের। দেশ অর্থাৎ জনগণ, জমি, জন্তু ও জল। অন্যভাবে বলা যায়, দেশের মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। লোকের দুঃখ-কষ্টকে অনুভব করা ও সহযোগিতা করাই সেবা। সমাজে যে দুর্বল তাকে সবল করা প্রয়োজন। এই জমি বা ভূমি আমার মা। এই ভূ-মাতার ব্যতীত আমার অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই। আমাকে তাঁর ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এখানকার সমস্ত প্রাণী এই ভূ-মাতার সম্পদ। এই সম্পদের রক্ষা ও সংবর্ধন করা প্রয়োজন। রক্ষা ও সংবর্ধন সেবা করেই হতে পারে, শোষণ করে নয়। সেবা করার জন্য নিজেরই এগিয়ে আসা প্রয়োজন, কোনো আদেশ

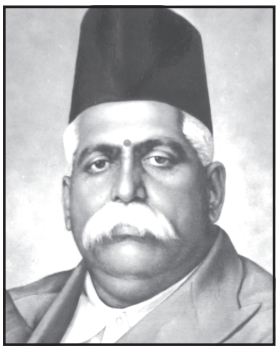

ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

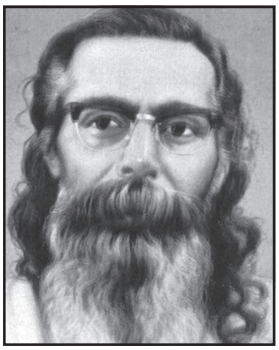

এম এস গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী)

বালাসাহেব দেওরস

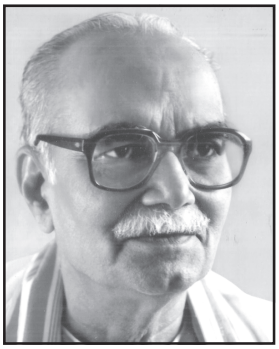

অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিং (রজ্জু ভাইয়া)

বা নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে। এই সেবাভাবও সঙ্ঘ-সাধনার যম-নিয়ম।

সঙ্ঘের চিন্তা-ভাবনা অত্যন্ত সরল এবং কার্যপদ্ধতিও সরল। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সঙ্ঘ এই কার্যপদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ ব্যবহারে রূপায়ণ করেছে। সঙ্ঘের হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শ্রীগুরুজীর সমগ্র দর্শন পড়াই যথেষ্ট নয়, তার জন্য সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি, শাখা, শাখার বিবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হয়। সঙ্ঘের সমালোচকরা এরকম কিছু না করেই সঙ্ঘের বিষয়ে বড় বড় মন্তব্য করে বসেন। সেজন্য তাঁদের সমালোচনা অজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে হয় এবং তা বোধগম্য হয় না ও হাসির খোরাকে পরিণত হয়।

সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি স্বয়ংঅনুশাসিত, স্বয়ংপ্রেরিত, স্বয়ংসঞ্চালিত এবং সার্বভৌম। সঙ্ঘ কোনো এক ব্যক্তি চালান না। সঙ্ঘ স্বয়ংশাসিত হওয়ার জন্য স্বশাসনের ওপর ভিত্তি করে চলে। সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের বাইরে থেকে প্রেরণা দেওয়া হয় না। তাঁরা অন্তর থেকে প্রেরণা প্রাপ্ত হন। সেই অন্তঃপ্রেরণা ধন, প্রসিদ্ধি ও পদের মোহ সৃষ্টি করে না। 'সঙ্ঘকার্য করাই আমার কর্তব্য'— এই বোধই তাঁদের প্রেরণা। সঙ্ঘের কাজ স্বয়ংসঞ্চালিত। নাগপুর থেকে চালানো হয় না। সঙ্ঘকাজের অর্থ হলো কর্তব্যভাবনায় দেশের কাজ করা। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকরা এরকম কাজ করছেন। এই সমস্ত কাজের সঞ্চালন স্বয়ংসেবকরা স্বয়ংপ্রেরণায় করে চলেছেন। তাঁদের কখনো কোনো প্রকার নির্দেশ দেওয়া হয় না। ভাবনা-চিন্তার বিনিময় করে, পরস্পর সহমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই তাঁরা কাজ করেন। এই পদ্ধতিকে ফ্যাসিস্ট বলার মতো মূর্খামি পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না। সঙ্ঘের তন্ত্র অর্থাৎ কার্যপদ্ধতি সার্বভৌম হওয়ার ফলে তাকে কারো ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। সঙ্ঘ কারো অধীন নয়, অথবা কারো আশ্রিত নয়। শাসন ক্ষমতারও মুখাপেক্ষী নয়। দু-চারটি ইংরেজি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা রাষ্ট্র,

কে এস সুদর্শন

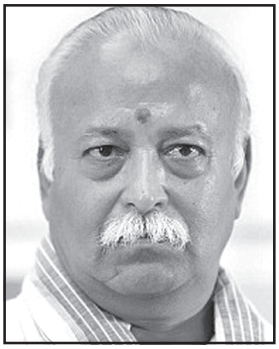

মোহনরাও ভাগবত

রাষ্ট্রীয়তা, বৈচিত্র্য বিষয়ে লিখে থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভারতবর্ষের আত্মার সম্পর্কে জ্ঞান একেবারে শূন্য। তাঁদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে কিছু প্রবন্ধ তাঁরা লিখে থাকেন, কিন্তু এরকম ব্যক্তিদের লেখা ভারতবর্ষকে বোঝার দৃষ্টিতে একেবারে শূন্য।

সঙ্ঘ-সাধনার ব্যাপকতা আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের বোধগম্য হয় না অথবা বুঝতে চান না। সেজন্য তাঁরা সরকারের রিমোট কন্ট্রোল রূপে সঙ্ঘকে বিচার করেন। রাজসত্তাকেন্দ্রিক সমাজ সংগঠনের ভাবনায় সঙ্ঘকাজের বিচার করা যেতে পারে না। রাজসত্তার ওপর ভিত্তি করে কোনো রাষ্ট্র বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের শক্তি তার চরিত্রবল ও মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে। কালের গতিতে রাজসত্তার পরিবর্তন হতেই থাকে। আমাদের দেশ হাজার বছর বিদেশি ক্ষমতার অধীন ছিল। কিন্তু তাতে আমাদের রাষ্ট্র নষ্ট হয়ে যায়নি। রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখার কাজ করেছে তার নৈতিক শক্তি ও জীবনমূল্যবোধ। সেই শক্তি ও বোধকে বৃদ্ধি করাই সঙ্ঘের কাজ।

সমানতাই সঙ্ঘকাজের ভিত্তি

সঙ্ঘ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করে চলেছে। অর্থাৎ সঙ্ঘ এই ভাব নির্মাণ করতে চায় যে, আমরা সবাই এই রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত। তাই আমরা এক ও সমান। যে কোনো সংগঠনের ভিত্তি সমতা ও সমানতা হওয়া প্রয়োজন। অসমতা বা বৈষম্যের ভিত্তিতে সমাজ সংগঠিত হতে পারে না। অসমতা সমাজে ভেদ নির্মাণ করে। সমাজে আলাদা আলাদা গোষ্ঠী তৈরি হয়। তাদের চাওয়া-পাওয়া আলাদা হয়। তা না হলে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সঙ্ঘ এগুলির মধ্যে নেই, বরং এই ভেদভাব বর্জন করতে চায়। অসমতা তৈরি হওয়ার যে কোনো কাজ বা ভাবনা সঙ্ঘকাজের মধ্যে নেই। শোষণমুক্ত, যুগানুকূল ও নির্দোষ সমাজ রচনা করাই সঙ্ঘকাজের অন্তিম লক্ষ্য। হিন্দু সমাজ সংগঠনের মতো ক্রিয়াশীল সঙ্ঘকাজের অর্থ অনুধাবন খুব জরুরি। নিজের মনমতো কিছু কঠিন শব্দের মাধ্যমে সঙ্ঘের ব্যাখ্যা করে সঙ্ঘকে গালিগালাজ করা বুদ্ধির দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ভুল তথ্য উপস্থাপন করে সমাজে শুধু ভ্রান্তি নির্মাণ করে চলেছেন।

এদেশের তথাকথিত পণ্ডিতদের মতে, আমাদের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইংরেজদের দান। এটা একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা। গণতন্ত্র হিন্দু সমাজের রক্তের মধ্যেই রয়েছে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলতে হয়, গণতন্ত্র ভারতের হিন্দুসমাজের ডি এন এ-র মধ্যে আছে। আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর আগে থেকে আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'হিন্দু ধর্ম ইজ পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন' অর্থাৎ হিন্দুধর্ম অনেক উপাসনা পদ্ধতির এক সম্মিলিত রূপ। গণতন্ত্রে মুখ্যত দুটি মৌলিক তত্ত্ব আছে। প্রথম, আমার মত যেমন সত্য, অন্যের মতও তেমন সত্য। দ্বিতীয়, নিয়মিতরূপে আলাপ আলোচনা করা। 'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' ও 'বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধ'— এই দুই আপ্তবাক্য গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। এই মৌলিক তত্ত্বই হিন্দু জীবনপদ্ধতির অবিভাজ্য অঙ্গ।

হিন্দুর কারণেই গণতন্ত্রের অস্তিত্ব

ভারত গণতান্ত্রিক দেশ, কারণ হিন্দুরা এখানে বেশি সংখ্যায় আছে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বলতে পারেন যে, ইংরেজরা আমাদের সংসদীয় কার্যপ্রণালী দিয়েছে। ব্যাস্, এতটুকুই। কিন্তু গণতন্ত্র আমাদের কেউ দেয়নি। গণতন্ত্র আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের পূর্বপুরুষের থেকে পেয়েছি। আমাদের হিন্দু জীবনপদ্ধতির এ এক অবিচ্ছিন্ন সংঘটক। এই জীবনপদ্ধতিকে রক্ষা করাই সঙ্ঘের কাজ। সেজন্য সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধি হলে অথবা সঙ্ঘের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হবে— এই মিথ্যা যুক্তি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। অসহিষ্ণু মতাদর্শ, পরিবারবাদ, ইসলামি জিহাদ, ছদ্ম সেকুলার মনোভাব, কমিউনিজম্ ও নকশালবাদ হলো গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। বর্তমানে এরা এক হয়ে হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করতে কটিবদ্ধ হয়েছে, আর হিন্দু সমাজ ধ্বংস হলেই গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটবে। বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখে, বুদ্ধির কচকচানি দিয়ে, কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগ করে দেশের মানুষকে এরা বিভ্রান্ত করে চলেছে। 'সত্যমেব জয়তে' ভারতের আপ্তবাক্য। অসত্য ভাষণে অমর্ত্য হওয়া যায় না। ইরফান শব্দের অর্থ জ্ঞান অথবা জ্ঞানী। ভুল লেখক ইরফান হতে পারে না।

সঙ্ঘের বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য স্বয়ংসেবক হতে হয়। জলের গভীরতা জলে না নেমে কীভাবে জানা যাবে? সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার রাষ্ট্রের উত্থানের জন্য অতি সহজ তন্ত্র দেশবাসীকে দিয়েছেন। সেই সঙ্ঘ-সাগরে অবগাহন করলে সমস্ত ভ্রান্তির অবসান হয়ে যাবে।

প্রমাণ চাই

রমানাথ রায়

দোষটা আমারই। অফিসের কাজে দিল্লি গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফোন করেছিলাম তিথিকে। তিথি তখন রাস্তা পেরোচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ফোন ধরতে গিয়ে রাস্তা পেরোতে পারল না। একটা ট্যাক্সি তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেল। তিথির পা ভাঙল। মাথাও ফাটল। ভর্তি হল হাসপাতালে। সাতদিন পরে হাসপাতাল থেকে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। তিথির মা ফোনে আমাকে সব জানালেন। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করলাম। ফোনে বললাম, দেখুন, আমি জানতাম না যে তিথি সেইসময় রাস্তা পেরোচ্ছে। তিথির মা আমাকে দিল্লি থেকে তাড়াতাড়ি আসতে বলছেন। কিন্তু আমার আসার উপায় নেই, আমি অফিসের বিশেষ কাজ নিয়ে দিল্লি এসেছি। কাজ শেষ না করে আমি কলকাতা ফিরতে পারব না। আমি একথা তিথির মাকে বুঝিয়ে বললাম। তিথিকেও ফোনে বোঝালাম। তিথি আমার কথা বুঝতে চাইল না। বলল, তুমি যদি তিন-চার দিনের মধ্যে না আসো তাহলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ। আমি কোনোদিন তোমার মুখ দেখব না। আমি বললাম, অসম্ভব। এখনও কলকাতা ফিরতে দিন পনের সময় লাগবে। তিথি বলল, তাহলে তুমি আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। আমি বললাম, তাই হবে। তিথি বলল, তুমি একটা শয়তান, তুমি একটা পাজি, তুমি একটা নচ্ছার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, থেমে গেলে কেন? আর কিছু বলবে না? তিথি তা শুনে আরও উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, তুমি একটা কুকুর, তুমি একটা শুয়োর, তুমি একটা ভাল্লুক, তুমি একটা হায়না। এসব শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছিল না। আমি মোবাইলের লাইন কেটে দিলাম। তিথি আর আমাকে ফোন করল না। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। সেইসঙ্গে তিথির ওপর রেগেও গেলাম। আমি তিথিকে ভালোবাসি। আমি পরোক্ষভাবে তিথির পা ভাঙার জন্য দায়ী, মাথা ফাটার জন্য দায়ী। আমি এর জন্য দুঃখিত। কিন্তু অফিসের কাজ ছেড়ে তিথির জন্য এখনই কলকাতায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। এলে অফিসের ম্যানেজারের কাছে কী কৈফিয়ত দেব? তিথিকে ভালবাসতে গিয়ে আমি নিজের ক্ষতি করতে পারব না। তিথিকে না পেলেও চলবে। কিন্তু চাকরি গেলে আমি চাকরি কোথায় পাব? তিথির চেয়ে চাকরি আমার কাছে অনেক বড়।

।। ২।।

ভেবেছিলাম অফিসের কাজ সেরে পনের দিন পরে ফিরতে পারব। কিন্তু কাজ শেষ করতে আরও বেশ কিছুদিন লেগে গেল। তারপর কলকাতায় ফিরে ঠিক করলাম তিথির সঙ্গে দেখা করব। পরমুহূর্তে মনে হল দেখা করা কি ঠিক হবে? তিথি আমার ওপর ভীষণ রেগে আছে। ও কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে? না চাইলেও আমার একবার যাওয়া উচিত। কারণ, এই দুর্ঘটনার জন্য পরোক্ষভাবে আমিই দায়ী। আমি তাই শেষপর্যন্ত এক রবিবারের সকালে তিথিদের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। ডোরবেল টিপতেই তিথির মা দরজা খুলে দিলেন। দিয়ে আমাকে দেখেই যেন একটু চমকে উঠলেন। বুঝতে পারলাম তিনি এইসময় আমাকে দেখার আশা করেননি। না করলেও তিনি বললেন, ভিতরে এসো।

আমি ভিতরে ঢুকলাম।

তিথির মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতদিন হল কলকাতায় ফিরেছ?

বললাম, দু-তিনদিন হবে। — বলে জিজ্ঞেস করলাম, তিথি কোথায়?

তিথির মা বললেন, ঘরে শুয়ে আছে।

— এখন আছে কেমন?

— ভালো।

— হাঁটতে পারছে?

— খুব ভালো পারছে না। তবে কষ্ট করে পারছে।

— আর মাথাটা?

— ওটাও ঠিক হয়ে গেছে।

— খুব ভালো। — বলে জিজ্ঞেস করলাম, আমি একবার তিথির সঙ্গে দেখা করব?

— করো। তবে সাবধানে কথা বলো, তিথি তোমার ওপর খুব রেগে রয়েছে।

— তা জানি।— বলে আমি তিথির ঘরে ঢুকলাম। তিথির মা ঢুকলেন না। তিনি নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

তিথি আমাকে দেখে উঠে বসল। বসে রাগের সঙ্গে ভুরু কুঁচকে বলল— তুমি!

খুব বিনয়ের সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ, আমি।

— কে তোমাকে আসতে বলেছে?

— কেউ বলেনি। আমি নিজেই এলাম।

— কেন এলে?

— তোমাকে ভালোবাসি বলে।

— মিথ্যে কথা। তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে, তাহলে একদিনের জন্য হলেও আমাকে দেখে যেতে। তা তুমি করোনি।

— কিন্তু সেটা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

— এটাও মিথ্যে কথা।

— মোটেও মিথ্যে কথা নয়। আমি সত্যি কথা বলছি।

— আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

— তাহলে আমার করার কিছু নেই।

— আছে, করার আছে। তুমি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

— তার জন্য কী করতে হবে বলো?

— তুমি আর আমাকে ফোন করবে না। তোমার ফোন ধরতে গিয়ে আমার পা ভেঙেছে, মাথা ফেটেছে। এবার কী হবে জানি না। — বলে একটু থেমে তিথি জিজ্ঞেস করল, তুমি সেদিন কী কথা বলতে গিয়েছিলে?

— একটা কথা বলার ছিল।

— কী কথা?

— পরে বলব। — বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

।।৩।।

মাঝে মাঝে তিথিকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু আমাকে দেখলে তিথি হয়ত খুব রেগে যাবে। আমাকে আজেবাজে কথা শোনাবে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো। আবার ফোন যে করব তারও উপায় নেই। তিথি ফোন করতে বারণ করে দিয়েছে। মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। কী করব বুঝে পেলাম না। অথচ আমার ওপর তিথির রাগ হাওয়া স্বাভাবিক হলেও আমার কিছু করার ছিল না। অফিসের কাজ ফেলে দিল্লি থেকে কী করে আসব? আসা সম্ভব নয়। তিথি এই কথাটাই বুঝতে চাইছে না। না চাইলে আমার কিছু করার নেই। অতএব আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কতদিন অপেক্ষা করব? যতদিন না তিথির রাগ পড়ে যায়, ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। ফলে মনে কষ্ট নিয়ে দিন কাটাতে লাগলাম।

প্রায় একমাস পরে আমার কপাল খুলে গেল। আমি তখন অফিসে বসে কাজ করছি। এমন সময় মোবাইল বেজে উঠল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে স্ক্রিনের দিকে তাকালাম। দেখি তিথি ফোন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ রেখে মোবাইল কানে রাখলাম।

— হ্যালো...

— কী করছ?

— অফিসে কাজ করছি। — বলে একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কেমন আছ?

— ভালো।

— হাঁটতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

— না।

— রাস্তায় বেরোচ্ছ?

— হ্যাঁ।

— ট্রামে-বাসে উঠতে পারছ?

— পারছি।

— বাহ! এটা খুব ভালো খবর। তাহলে চলো একদিন আমরা আবার আগেকার মতো ঘুরে বেড়াই। তোমার এতে কোনো আপত্তি নেই তো?

— তা নেই। কিন্তু তার আগে আমি

একটা কথা জানতে চাই।

— কী কথা?

— তুমি দিল্লি থেকে ফোন করে আমাকে কী কথা বলতে চেয়েছিলে?

— পরে বলব।

— এখন বলা যাবে না?

— না।

— তাহলে তোমার সঙ্গে আর কথা নয়। — বলে তিথি মোবাইল বন্ধ করে দিল।

।। ৪।।

আমার কেউ নেই। দশ বছর আগে বাবা মারা গেছে। তিন বছর আগে মা মারা গেছে। আমার মা তিথির মা-র সঙ্গে এক অফিসে কাজ করত। দুজনের মধ্যে তাই একটা ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এই সম্পর্কটা আরও তীব্র হয়েছিল তিথির বাবার মৃত্যুর পর। তিথির বাবা পাঁচ বছর আগে ক্যান্সারে মারা গেছে। মৃত্যুর আগে তিথির বাবা মা-কে অনুরোধ করে বলেছিল, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। আমার মেয়েটাকে দেখবেন। ও বড় ভালো মেয়ে। আপনার ছেলের সঙ্গে তিথির বিয়ে হলে আমি শান্তি পাব। মা এই অনুরোধ রাখতে পারেনি। তার আগেই মা মারা গেল। কিন্তু মৃত্যুর আগে মা আমাকে বলে গিয়েছিল, আমি যেন তিথিকে বিয়ে করি। আমার বিয়ে করতে আপত্তি নেই। কিন্তু তিথি কি ঘর-সংসার করতে পারবে? আজকাল অনেক মেয়ে বিয়ে করে। তারপর ঘর ভেঙে চলে যায়। ঘর-সংসার করার যোগ্যতা তাদের নেই। তাই আদালতে ডিভোর্সের মামলার পাহাড় জমছে। তিথিও হয়ত আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু তারপর? ও কি পারবে ঘর-সংসার সামলাতে? পারলে ভালো। না পারলে অশান্তি। নানা ধরনের ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে। আমি এখন একা আছি, ভালো আছি। নিজে রান্না করি, নিজে বাসন মাজি, ঘরদোর পরিষ্কার করি, নিজের কাপড় নিজে কাচি। কোনো অসুবিধা নেই। বিয়ে করলে আমরা দু'জন হব। আমাদের কাজ অনেক বেড়ে যাবে। আমি একা সব সামলাতে পারব না। তিথিকে দায়িত্ব নিতে হবে। তিথি কি সেসব দায়িত্ব সামলাতে পারবে? তার উপর আবার পা ভেঙে বসে আছে। ওর তো বিয়ে হওয়াও মুশকিল। আমি ছাড়া কে ওকে বিয়ে করবে? ফলে আমাকেই বিয়ে করতে হবে। কিছু করার নেই। মা তিথির বাবাকে কথা দিয়েছে। আমি আবার মাকে কথা দিয়েছি। কথা অবশ্য না রাখলেও চলে। কিন্তু তিথিকে না পেলে আমার যে মন খারাপ হয়ে যাবে। তবে এখানে একটা কথা আছে। আমি তিথিকে ভালোবাসি।

With Best Compliments from -

A

Well

Wisher

তিথি কি আমাকে ভালোবাসে? এটাই আসল কথা। এটা জানা গেলে তখন বিয়ের কথা ভাবা যাবে। কিন্তু কথাটা কীভাবে জানব? ফোন করে জানা যায়। না, ফোন করা যাবে না। তিথি ফোন করতে বারণ করেছে। বারণ করাই স্বাভাবিক। একবার ফোন ধরতে গিয়ে ওর পা ভেঙেছে, এবার ফোন ধরতে গিয়ে আবার কোন দুর্ঘটনা ঘটবে তা বলা যায় না। তিথি হয়ত বাসে উঠছে। কিংবা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, কিংবা বাথরুমে আছে, তখন ফোন ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। অতএব তিথির কথামত তিথিকে ফোন না করাই ভালো। কথা যদি বলতে হয় তাহলে তিথিদের ফ্ল্যাটে যাওয়া উচিত। সস্তা উপন্যাসের নায়কদের মতো জিজ্ঞেস করব। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি কি আমাকে ভালোবাস? এর উত্তরে তিথি যা বলবে সেই অনুযায়ী কাজ হবে।

।। ৫।।

যেতে হবে, তিথির কাছে যেতে হবে। খোলাখুলি কথা বলতে হবে। কিন্তু তিথি তো আবার সেই এক প্রশ্ন করবে। জানতে চাইবে, দিল্লি থেকে আমি কী কথা তিথিকে বলতে চেয়েছিলাম। আমি এর উত্তরে কী বলব? সত্যি কথা বলতে কী, এর উত্তর আমার জানা নেই। কারণ, আমি কোনো বিশেষ কথা সেদিন তিথিকে বলতে চাইনি। বলার ছিল না। আমি শুধু কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিথি কি একথা বিশ্বাস করবে? করবে না। কেউই করে না। অথচ আমরা যখন ভীষণ একা হয়ে যাই, পাশে কেউ থাকে না, তখন আমরা কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই। কোনো জরুরি কথা নয়। খুব সাধারণ, খুব তুচ্ছ কথা। আমি তো এরকম করে থাকতাম। এখন আর করি না। কারণ এরকম করতে গিয়ে সকলের কাছে আমি অপ্রিয় হয়ে গেছি। আগে শুধু কথা বলার জন্য বন্ধুদের ফোন করতাম। বলতাম, কথা আছে। একবার আসতে পারবি? বন্ধুরা সন্ধেবেলা আসত। আমাদের মধ্যে নানা কথা হত। কিন্তু কাজের কথা কিছু হত না। বন্ধুরা শেষে জিজ্ঞেস করত, কী জন্য ডেকেছিলি? বলতাম, এমনি ডেকেছিলাম। বন্ধুরা রেগে গিয়ে জানতে চাইত, এমনি মানে? বলতাম, ভীষণ একা লাগছিল। তাই তোদের ডাকলাম। বন্ধুরা তা শুনে বলত, আমরা নানা কাজ ফেলে এলাম। ভাবলাম, তোর নিশ্চয় কোনো জরুরি কথা আছে। তাই আমাদের ডেকেছিস। এখন বলছিস কোনো কথা নেই। এমনি আমাদের ডেকেছিস! আর কোনোদিন এভাবে আমাদের ডাকবি না। শুধু তাই নয়, ফোন করেও আমাদের বিরক্ত করবি না। আমরা সবসময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। তোর ফোন এলে বুঝতে পারি আধ ঘণ্টাতেও তোর কথা শেষ হবে না। একথা শুনে আমি তাদের শান্ত করার চেষ্টা করতাম। তারা শান্ত হত না। তারা আমায় গালাগাল দিতে দিতে চলে যেত। আমি মন খারাপ করে তখন একা ঘরের মধ্যে বসে থাকতাম। তখন তিথি আমায় বাঁচাত। তিথির সঙ্গে ফোনে বকবক করতাম। তিথিও মাঝে মাঝে বিরক্ত হত। তবে বিরক্ত হলেও বন্ধুদের মতো আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেনি। তাই শুধু কথা বলার তাগিদেই দিল্লি থেকে তিথিকে ফোন করেছিলাম। আর তার জন্যই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এর জন্য আমার আফসোসের শেষ নেই। কিন্তু আমি কী করব! তিথিকে কী বলব এখন?

।। ৬।।

এক রবিবার আমি তিথিদের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। তিথির মা তখন ঘরে ছিলেন না। ফ্ল্যাটে তিথি একা ছিল। তাই তিথিকে বললাম, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল।

তিথি জিজ্ঞেস করল, কী কথা?

— বলব?

— বলো। কিন্তু তার আগে বলো তোমার কী এমন কথা ছিল যার জন্য দিল্লি থেকে আমাকে ফোন করেছিলে?

এবার সুযোগ পেয়ে যে কথা বলতে এসেছিলাম সেই কথাটা বলে ফেললাম। আমি ফোন করে বলতে চেয়েছিলাম আমি তোমাকে ভালোবাসি। সেই সঙ্গে জানতে চেয়েছিলাম তুমি কি আমাকে ভালোবাস? কিন্তু উত্তর পাওয়ার আগেই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তোমার পা ভেঙে গেল।

— মিথ্যে কথা। তুমি আমাকে ভালোবাস না।

— কী বলছ তুমি! আমি তোমাকে ভালোবাসি না?

— না। তবে আমি তোমাকে ভালোবাসি।

— আমার ভালোবাসা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে তোমার ভালোবাসাও মিথ্যে।

— বাজে কথা। আমার ভালোবাসা সত্যি বলে আমি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তোমার ফোন ধরতে গিয়েছিলাম। আর তাতেই দুর্ঘটনা ঘটল। কিন্তু তুমি এরকম কোনো প্রমাণ দিতে পারবে না।

এবার গম্ভীর গলায় জানতে চাইলাম, কী প্রমাণ চাও তুমি? ছাদ থেকে ঝাঁপ দেব? ট্রেনের লাইনে গলা পেতে দেব? বিষ খাব? গলায় দড়ি

দেব?

তিথি হেসে বলল— না, এসব কিছু করতে হবে না।

— তাহলে কী করতে হবে?

— তোমার জন্য আমার পা ভেঙেছে। আমি চাই তোমার একটা হাত ভাঙুক।

— কোন হাত?

— যে কোনো হাত।

— তাহলে তুমি খুশি হবে?

— হ্যাঁ।

ঠিক এইসময় তিথির মা ঘরে ঢুকলেন। ঢুকে আমাকে দেখে বললেন, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল!

জিজ্ঞেস করলাম, কী কথা?

— আমার বয়স হচ্ছে। শরীরটা আজকাল ভালো যায় না। যে কোনোদিন মারা যেতে পারি। আমি তাই মৃত্যুর আগে তোমাদের বিয়ে দিয়ে যেতে চাই। তিথির বাবার এই ইচ্ছে ছিল। তোমার মা-ও কথা দিয়েছিল। তাই আর দেরি না করে তোমরা বিয়ে করলে আমি শান্তিতে মরতে পারি।

আমি বললাম, আমি তো তাই চাই। কিন্তু....

তিথির মা একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কী?

— তিথিকে আমি ভালোবাসি কিনা তার প্রমাণ তিথিকে দিতে হবে।

— কী প্রমাণ ও চাইছে?

— আমার জন্য তিথির পা ভেঙেছে। তিথি চায় ওর জন্য আমাকে আমার হাত ভাঙতে হবে। তবেই প্রমাণ হবে আমি ওকে ভালোবাসি।

তিথির মা একথা শুনে তিথির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, তুই একথা বলতে পারলি? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

তিথি বলল, আমার মাথা খারাপ হয়নি। আমি ঠিক কথা বলেছি। আমি বুঝতে পারলাম এবার মা ও মেয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যাবে। এর মধ্যে আমার থাকা উচিত নয়। আমি দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

রাত্রিবেলা তিথির ফোন এল। ফোনে বলল, মা যা-ই বলুক, হাত তোমাকে ভাঙতেই হবে।

বললাম, আচ্ছা!

।। ৭ ।।

আমার হাত এখন আমাকে ভাঙতে হবে। কিন্তু কীভাবে? একজনকে বললাম, আমার হাতটা ভেঙে দিতে পারবে? তার জন্য আমি টাকা দেব। একথা শুনে তারা জিজ্ঞেস করল, হাত ভাঙার এত ইচ্ছে কেন? কারণটা বললাম। তা শুনে তারা হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, যান, বাড়ি যান। পাগলামি করবেন না। আমি তখন নিজেই নিজের হাত ভাঙার চেষ্টা করলাম। প্রথমে ঠিক করলাম একটা হাতুড়ি নিয়ে নিজের হাতের ওপর আঘাত করব। কিন্তু এতে সমস্যা আছে, হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার পর দেখা গেল হাতের মাংস থেঁতলে গেল। অথচ হাড় ভাঙল না। তখন আমি যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকব। আমাকে হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হতে হবে। সে খুব কষ্টকর ব্যাপার। আমি সে কষ্ট সহ্য করতে পারব না। তার চেয়ে আর এক কাজ করি। এটা অনেক সহজ। আমি চলন্ত বাসে উঠতে পারি, নামতে পারি। চোখ বন্ধ করে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারি, নামতে পারি। কিংবা অসতর্ক

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

হয়ে রাস্তা পেরোতে পারি, গর্তে ভরা ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে পারি। এসব করলে আমার ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা আছে। হাত ভাঙার কিংবা পা ভাঙারও সম্ভাবনা আছে। তবে পা ভাঙলে চলবে না। হাতটাকেই ভাঙতে হবে। তিথির নির্দেশ।

ভাবনামতো আমি কাজ শুরু করে দিলাম। চলন্ত বাসে উঠতে লাগলাম। নামতে লাগলাম। চোখ বন্ধ করে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলাম। নামতে লাগলাম। অসতর্ক হয়ে রাস্তা পেরোতে লাগলাম, গর্তেভরা ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু আমার কপাল খারাপ, দু-একবার পড়ে গিয়ে হাত-পা ছড়ে গেল, রক্ত বেরোল। তবে হাত ভাঙল না। বুঝতে পারলাম, নিজের হাত নিজে ভাঙা সম্ভব নয়। ফলে মন খারাপ করে অফিসে কাজ করতে লাগলাম। রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ঘরে চুপ করে বসে থাকতে লাগলাম।

ঠিক এইসময় অফিস থেকে নির্দেশ এল, আমাকে আবার দিল্লি যেতে হবে। এবার আর একমাস-দু'মাসের জন্য নয়, দীর্ঘ কয়েকমাসের জন্য।

আমি তাই একদিন বিদায় নেবার জন্য তিথিদের বাড়ি গেলাম। দেখলাম, তিথির মা অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। আমি তাঁকে আর বিরক্ত করলাম না। তিথিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, তোমার কথামতো আমি আমার হাত ভাঙতে পারলাম না। তুমি আমাকে ভুলে যাও।

তিথি কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

।। ৮ ।।

দিল্লিতে এলাম। অফিসের কাজ করতে লাগলাম। তবে মনে শান্তি নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ আমি অনেক চেষ্টা করেও নিজের হাত ভাঙতে পারিনি। ফলে তিথির কাছে প্রমাণ হয়ে গেল আমি তিথিকে ভালোবাসি না। অতএব বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না। এই কারণেই হয়ত তিথি আমাকে ফোন করে না। আর আমিও যে তিথিকে ফোন করব তার উপায় নেই। তিথি আমাকে ফোন করতে বারণ করেছে। কিন্তু প্রায় দেড় মাস পরে তিথি আমাকে ফোন করল।

— হ্যালো...

— একটা খুব খারাপ খবর আছে।

— কী খবর?

— সাতদিন হল মা মারা গেছে।

— সে কী! আমাকে জানাওনি কেন?

— জানিয়ে কী হত? তুমি তো আসতে পারতে না।

— বাজে কথা। আমি ঠিক চলে আসতাম।

— মিথ্যে কথা।

— সত্যি কথা। — বলে একটু থেমে বললাম, এখন এসব কথা থাক। তুমি এখন কোথায় আছ?

— মামার বাড়িতে আছি। আমার কিছু ভালো লাগছে না। নিজেকে ভীষণ একা মনে হচ্ছে। কী করব বুঝে পাচ্ছি না।

— তুমি আমার কাছে চলে এসো। আসবে?

— আসব।

— তবে আমি কিন্তু আমার হাত আজও ভাঙতে পারিনি।

— তার আর দরকার নেই। আমার এখন তোমার শক্ত মজবুত হাত চাই।

তা শুনে খুশি হয়ে বললাম, ধন্যবাদ। ■

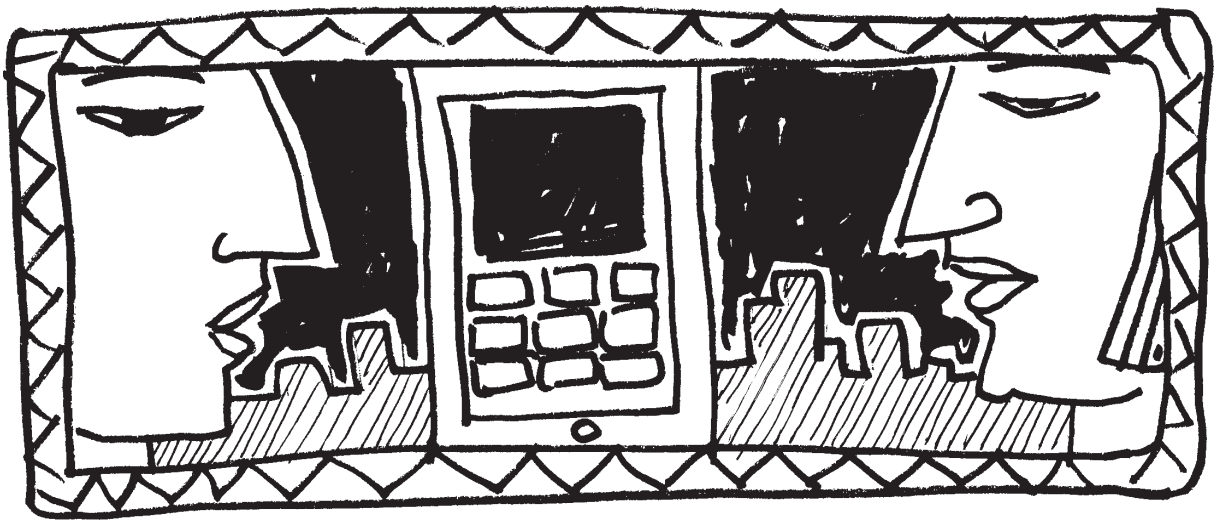

With Best Compliments.....

P.C.CHANDRA™
JEWELLERS

A jewal of jewels

Kolkata Showroom : Bowbazar : 2227-7272, Global - 2226-3700, Gariahat : 2416-8680,
Chowringhee : 2223-8062, Golpark : 2464-5370, Ultadanga : 2355-4747,
Fax - 2355-3254, Barasat : 2584-3093, West Bangal Showrooms :
Asansol :(0341) 2274-331, Siliguri : (0353)-2532194, Malda : (03512) 256558,
Burdwan : (0342) 2569652, Midnapore : (03222) 261996, Berhampore : (03482) 259066,
Cooch Biaar : (03582) 228301, Serampore : 2652-6413/14, Behala : 23970201,
Durgapur : (0342) 2588121, Kanchrapara : 2585-4416/17, Tamluk : (03228) 266525
Other States Showrooms : Dehli : (011) 40616364 / 26270034 / 26270002, Bengaluru
(080) 49344444, Bhubaneshwar : (0674) 2380-887, Agartala : (0381) 2326666,
Chandan Nagar : 26858581, Howrah : 9836211515 / 9836211717

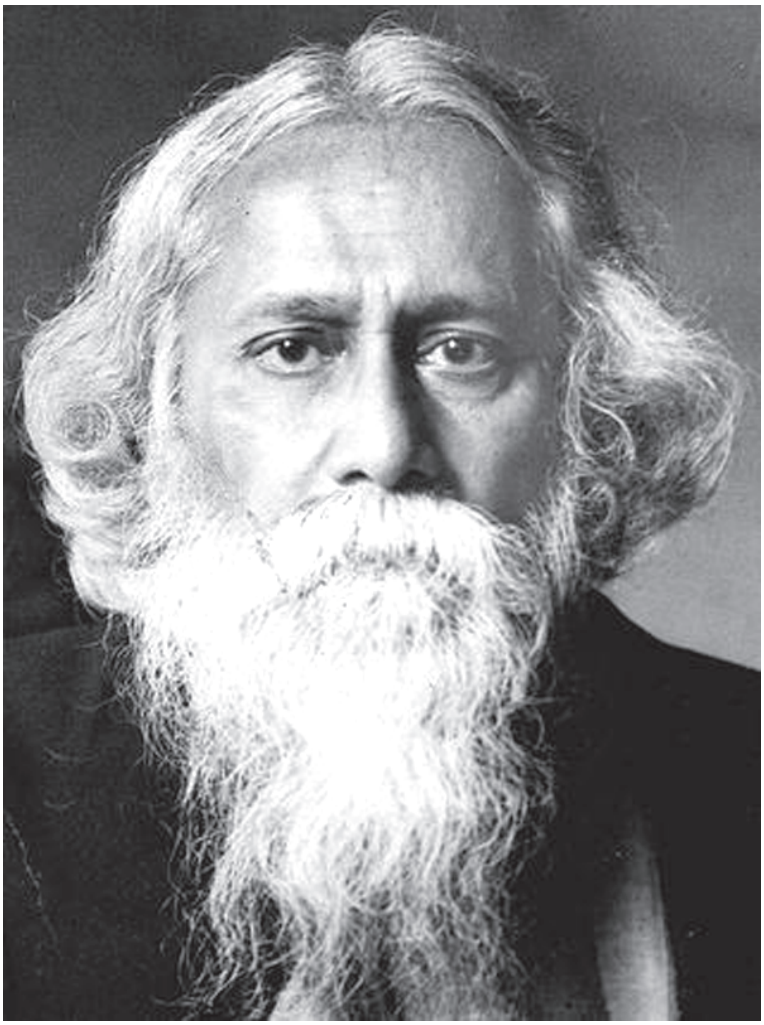

মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথের সন্ধান

অচিন্ত্য বিশ্বাস

আদর্শ-সন্ধান কথাটি বড়ো। সময় সীমার চলমান অবস্থায় আদর্শ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাকে পেতে হয় কর্ম, জ্ঞান ও উদ্দেশ্য-সাধনের নিবিড় মেলবন্ধনে। বর্তমানে তাকে চেনা কঠিন। আদর্শকে পেতে চাই সময় বীক্ষা, যে সময় চলে গেছে— সেখানকার সব কথা এখন আর পুনর্গঠিত হবার নয়। অথচ সময় তো নদীর ধারার মতো। তাকে দূর থেকে দেখলে দিগন্তে মিশে যায়; উঁচু থেকে দেখলে ছবির মতো লাগে। যেভাবেই দেখি সময় পরিধিতে কখনো কখনো জেগে ওঠে মানব-পুঞ্জ। তাদের সমবেত আকাঙ্ক্ষা আশ্রয় করে আদর্শ। আর আদর্শ রচনা করতে চায়। মানব-পুঞ্জের এই সমবায়িক প্রত্যয়কে ইতিহাসের নিভৃতে জ্বলে উঠতে দেখি। নালন্দার কোনো তাৎপর্য ছিল না বক্তিয়ার খলজির কাছে। তার অশ্ব ক্ষুরধ্বনির সঙ্গে বুদ্ধের ধর্ম বা সঙ্ঘের কোনো মিল ছিল না। বক্তিয়ার নালন্দা ধ্বংস করেছে। আজও তার কথা ভেবে যারা একটি জনপদকে বক্তিয়ারপুর বলে জানে তাদের ইতিহাসবোধ নেই— সময় প্রবাহে তারা আবর্জনার মতো— অনুদ্দেশ্যে ভেসে যাচ্ছে। আর নালন্দাকে যখন পুনরাবিষ্কার করা গেল তখন তার মধ্য দিয়ে আদর্শকে আশ্রয় করা হলো। ইতিহাসের এই গতি একই সঙ্গে অতীত ও বর্তমানকে ছুঁয়ে ভবিষ্যৎকে সম্ভাবিত করল। বক্তিয়ার এই আদর্শকে তরবারির আঘাতে নিকেশ করতে পারেনি। শুনতে পাই বাংলাদেশে কারা যেন বক্তিয়ার উৎসব পালন করে থাকে। তারা এক মূর্খ-ধর্মান্ধ-লুঠেরার মধ্যে আত্মমর্যাদা খুঁজে পেতে চাইছে। এর মধ্যে বর্তমানের সময় সীমায় তরঙ্গ বা ঘূর্ণন তৈরির চালাকি থাকতে পারে। ইতিহাস নেই। আদর্শ থাকতেই পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েকটি বছর আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি বছরে ইতিহাসের দিকে পাশ ফিরে দেখতে চেয়েছেন আদর্শের দ্যুতিময় বুদ্বুদ। ক্ষণিকের ক্ষীণ দীপ্তি সেসব। তবে মধ্যযুগের সঘন অন্ধকারে এইসব দীপ্যমান উৎস তাঁকে পথ চিনতে সাহায্য করেছিল। মধ্যযুগ অন্ধকার কেন? এর উত্তর খুঁজেছে পাশ্চাত্য। একজন সমালোচক লিখেছেন :

'The gulf which separates ancient literature from modern may be baidged. But its depths have never been satisfactorily explored.' ("The Dark Ages"– শীর্ষক নবম পরিচ্ছেদ, 'The Making of Literature'; আর. এ. স্কট জেমস; Allied Publishers

গুরুগোবিন্দ সিং

Pvt. Ltd., নতুন দিল্লী-বম্বে-কলকাতা- মাদ্রাজ...; ১৯৮৩; প্রথম সংস্করণ— ১৯৩০; ৯৫ পৃ.)।

কোথায় আছে মনুষ্যত্বের দীপ্তি ও আদর্শ? বিশেষত একাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্বে— ভারতবর্ষ যখন মুসলমান বিদেশিদের শাসনে শাসিত হচ্ছে, তখন কি কোথাও তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে কবি-কল্পনা খুঁজে ফিরেছে মধ্যযুগের তামসিক পরিসরে সম্ভাব্য কিছু ক্ষেত্র— যেখানে ব্যতিক্রমের ঝঙ্কার শোনা গেছে। অতি সামান্য, কিন্তু উজ্জ্বলতায় উদ্দীপিত হবার মতো শব্দ চিত্র এসব— ইতিহাসের এক পাশে সরে থাকা। রবীন্দ্রনাথ তেমনি কিছু উপাদান আনলেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই।

শিখ ইতিহাস : ভারতের উত্তর-পশ্চিমে জেগে ওঠা এই নব ধর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু গদ্য ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মন এই ধর্মান্দোলন-জনসঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী উদ্দীপনাকে গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর লেখা কয়েকটি রচনার উল্লেখ করছি :

১. 'কাজের লোক কে'; ২. 'বীর গুরু'; ৩. 'শিখ স্বাধীনতা'; ৪. 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ'—

লেখাগুলি 'ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক পড়ে নেবেন।

শিখ ইতিহাস রবীন্দ্র কাব্যে এসেছে। 'কথা'-র অন্তর্গত কয়েকটি কবিতায় পাচ্ছি সেই ইতিহাসের চিত্র। সে চিত্র বহুমাত্রিক—উদ্দীপনা ও আদর্শের রুদ্র পরিসর। যেমন,

১. 'বন্দী বীর'; ২. 'প্রার্থনাতীত দান'; ৩. 'গুরু গোবিন্দ'; ৪. 'শেষ শিক্ষা'।

ভালো করে বিচার করলে এই চারটি কবিতার দুটি অংশ। প্রথম, 'বন্দী বীর' ও 'প্রার্থনাতীত দান' হলো শিখ ইতিহাসের গৌরব পর্বের—আত্মত্যাগের মহৎ আদর্শ সঞ্চারের বাতাবরণে রচিত। দ্বিতীয়, 'গুরু গোবিন্দ' আর 'শেষ শিক্ষা'-য় শিখ ধর্মান্দোলনের পরিণতি ও আদর্শচ্যুতি বা আত্ম-সমালোচনার ইঙ্গিতে পূর্ণ। গুরু নানক আর গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবন-নীতি রবীন্দ্র বীক্ষায় সামান্য সমান্তরাল বোধ হয়। তাঁর ভাষা :

'গোড়ায় ধর্মের ইতিহাস রূপে শিখ-ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছিল। বাবা নানক যে স্বাধীনতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে।'

অন্যপক্ষে গুরু গোবিন্দ সিংহ সেই পথ থেকে শিখদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উদ্যমে প্ররোচিত করলেন। ফলে, রবীন্দ্রনাথের ধারণায় : 'বাবা নানক পাথেয় দিয়া তাহাদিগকে একটি উদার পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই পাথেয় তাহারা এইখানেই খরচ করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের যাত্রাও তাহারা এইখানেই অবসান করিয়াছিল।' উক্ত চারটি কবিতায় প্রসঙ্গটি প্রমাণিত হয়।

'বন্দীবীর' মোগল শাসনের বিরুদ্ধে শিখদের এক অপরূপ আত্মত্যাগের বিবরণ। 'অলখ নিরঞ্জন'— উচ্চারণে পাঞ্জাব যে ধর্মরাজ্য গঠন করতে চেয়েছে তা কবি-প্রস্তাবিত ভারতবর্ষীয় আদর্শবাদ। শত অত্যাচারেও যে বীরত্ব পরাঙ্মুখ হয় না— পুরুবিক্রমে যার সূচনা— তাঁরই উজ্জ্বল রক্তরচিত জীবনগাথা। কবির বিস্ময় ঃ

'পঞ্চনদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্ত লহরী
মুক্ত হইল কি রে!
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে
বীরগণ জননীরে
রক্ত তিলক ললাটে পরালো
পঞ্চনদীর তীরে'।

একথা ঠিক, গুরুদাসপুর গড়ের যুদ্ধে তুরানি মোগলরাই বিজয়ী। বন্দী বান্দা ও সাতশত শিখ সেদিন মরণ আলিঙ্গনে চলেছিল। কিন্তু তাদের সেই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃত ভারত ভারতবর্ষ-কে :

'সম্মুখে চলে মোগল-সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্শা ফলকে তুলি।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে
বাজে শৃঙ্খল গুলি'।

এই পরাজয় বিজয়ের ভূমিকা বলেই গণ্য। কারণ দেশ মাতৃকার সম্ভ্রম রক্ষার এই সংগ্রাম। 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান' তার উত্তেজনায় কম্পবান।

মোগল বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত ইতিহাসের বিদেশি আদর্শ পোষিত পণ্ডিতরা দূরবীক্ষণ যোগে মানবিকতা খুঁজে পান বটে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে। দেখিয়েছেন :

'সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বান্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বান্দার এক ছেলে।
কহিল, 'ইহারে বধিতে হইবে
নিজহাতে অবহেলে'।

এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বিচারব্যবস্থা ইসলাম সম্মত। পাশাপাশি নিজ হস্তে নিজপুত্রকে হত্যা করার পরও পরিত্রাণ পাননি বান্দা। সুসভ্য শরিয়তি বিধান অনুসারে বান্দাও ঘাতকের হাতে নিহত হলেন।

'সভা হল নিস্তব্ধ
বান্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ'।

এই ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে সাতশ বছরের বিধর্মী-বিজাতীয় শাসকদের ব্যতিক্রমহীন ঘটনাস্রোত। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মনশ্চক্ষে কোনো মহাঞ্জন ছিল না।

'প্রার্থনাতীত দান' কবিতাটি ছোট, কাছাকাছি সময়ে— মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে রচিত। 'বন্দীবীর' লেখা হয় ৩০ আশ্বিন ১৩০৬ আর 'প্রার্থনাতীত দান' কবিতাটির রচনাকাল ২ কার্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। পাঠানদের আক্রমণে ধ্বস্ত সুহিদ্‌গঞ্জ যেদিন 'রক্তবরণ' হলো— বন্দী হলেন বীর তরু সিং, নবাব তাঁকে ক্ষমা করতে চাইলেন। তরু সিং-এর দৃপ্ত পরিহাসপূর্ণ উক্তি : 'মোরে কেন তব/এত অবহেলা ভাই?' নবাব বীর তরু সিং-এর

বান্দা বৈরাগী

শিরোভূষণটি পেতে চাইলেন। তরু সিং গুরুগোবিন্দ সিং-এর দীক্ষায় দীক্ষিত— পঞ্চ-প্রতীকের সম্মান রক্ষা তাঁর লক্ষ্য। এই জীবনাদর্শ পাঠান নবাবের স্বেচ্ছাচারের কাছে বলি দেবেন কেন। তিনি বললেন—

'যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব,
বেণীর সঙ্গে মাথা।'

এই বীরত্বের ইতিহাস মধ্যযুগের ঘোর অন্ধকারে দীপ্ত দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ।

অন্য দুটি কবিতা 'গুরু গোবিন্দ' (২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ) আর 'শেষ শিক্ষা' (৬ কার্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)— গুরুগোবিন্দ সিং-কে নিয়ে। 'গুরুগোবিন্দ'-এ আছে আত্মসমালোচনার অবসর। রামদাস-লোহারি-সাহু প্রভৃতি ছয় অনুচরকে ডেকে বললেন গুরু— তিনি যমুনা তীরে নির্জনে আত্ম-সাধনা করবেন। তাঁর এখন 'জীবন রঙ্গভূমি'-র লীলা চঞ্চল 'মানব সাগরে'র 'চিরক্রন্দিত-ঊর্মি-নিনাদ' শোনার সময় নেই— 'আপন গোপন কাজে' তিনি থাকতে চান কিছুদিন। একটা সময় ছিল যখন তিনি যুদ্ধোদ্যমে আনন্দ পেতেন। আজও সেকথা স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল :

'হায়, সেকি সুখ, এ গহন ত্যাজি
হাতে লয়ে জয় তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হাসিতে তীক্ষ্ণ ছুরি'!

কিন্তু আজ তাঁর মনে হয়েছে সেই রণোন্মাদ খুব সার্থক নয়। তিনি যেন ধর্মানুশাসন থেকে বিচ্যুত হয়ে 'পাঞ্জাব জুড়ি'

'উন্মাদ কোলাহল' ঘনিয়ে তুলেছেন মাত্র। একথা ঠিক, তাঁর রণোন্মত্ত উদার আহ্বান বিফলে যায়নি। ছোট-বড় উচ্চ-নীচ জাতি চেতনা ভুলে পাঞ্জাবে জেগেছে ভারতবর্ষের সম্ভাবনা। সেই ভারতবর্ষ— যা কবির ধ্যানলোকে বার বার অভিঘাত হেনেছে। সেকথায় পরে আসব। এখন দেখাই গুরুগোবিন্দ সিংহ যে দেশ গড়ার বাসনাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ঃ

'যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক
ভরে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।'

কিংবা এইভাবে বারো বছরের সংগ্রামের শেষে গুরু চাইছেন যে পূর্ণতা, তা-ও তো ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করে বৃহৎ মহৎ এক দেশকেই খুঁজে ফেরা। তাঁর আকুল আহ্বান :

'তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ'!

এই দেশ চেতনার 'অনন্ত জ্যোতি'-ই আজকে বীর বিক্রমে স্পষ্ট জানালেন গুরু। যে ধর্ম নির্বীর্য হতে শেখায়— দেশকে ভুলে মন্দিরের চন্দন তিলক প্রদীপে ঘণ্টায় অন্তরীণ থাকে— গুরু সেই ধর্মের পথিক নন।

'শেষ শিক্ষা'-র গভীর তাৎপর্য সহজে বোঝা যাবে না। এক মুসলমান ঘোড়া বিক্রেতাকে একদিন ঘোড়ার দাম চাইবার ও বার বার বিরক্ত করার জন্য বিনা দোষে গুরু হত্যা করেছিলেন। ঠিক বিনা দোষে নয়, ক্ষণক্রোধ ও মিথ্যা অপবাদের কারণে।

'পাঠান কহিল রোষে, 'মূল্য আজই চাই।'
এত বলি জোর করি ধরি তাঁর হাত—
চোর বলি দিল গালি। শুনি অকস্মাৎ
গোবিন্দ বিজুলি-বেগে খুলি নিল অসি,
পলকে সে পাঠানের মুণ্ড গেল খসি;
রক্তে ভেসে গেল ভূমি'।

এরপর গুরুগোবিন্দ সিংহ 'নিরর্থক রক্তপাত'-এর জন্য আত্ম শোধন করার সাধনায় লিপ্ত হলেন। ওই পাঠানের পুত্র মামুদকে এনে নিত্য পিতৃস্নেহে লালন করতে লাগলেন। মামুদ বড় হবার পর তাকে উত্তেজিত করলেন গুরু— পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বাধ্য করলেন। এই তাঁর শেষ শিক্ষা।

আদর্শের মণি-মঞ্জুষায় যে চির পদার্থ তাতে অন্যায় অপরাধকে আড়াল করার ব্যাপার সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই মামুদের প্রতি অমোঘ আদেশ গুরু গোবিন্দের—

'পাষাণে এই-যে রাঙা দাগ, এ তোমার
আপন বাপের রক্ত।...
আজ আসিয়াছে দিন,
রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোলো তরবার—পিতৃ ঘাতকেরে বধি
উষ্ণ রক্ত-উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষাতুর প্রেতাত্মার'।

কিন্তু মামুদ তাঁকে 'পিতা গুরু বন্ধু বলে' জেনে এসেছে— একাজ করতে দ্বিধা জানাল। বারবার উত্তেজিত করলেন গুরু। শেষ পর্যন্ত মামুদ তাঁকে হত্যাই করল। ধর্ম যাত্রার এ আদর্শ ভারতবর্ষের চিরকাল ধরে লালিত হয়েছে। প্রভাত সময়ের শঙ্খনাদে শুরু হয়েছে যুদ্ধ— সম্মুখ সমরে বীরগতিকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা হয়েছে, মিথ্যা ভাষণ, কপট যুদ্ধকে নিন্দার্হ ভাবা হয়েছে। সন্ধ্যা সূর্যকে সাক্ষী রেখে বেজেছে শঙ্খ— যুদ্ধের সাময়িক বিরাম হয়েছে। পরাজিত সেনাপতিকে ক্ষমা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আমাদের যুদ্ধনীতি। আর সেই নীতি পালন করেছেন বলেই পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিদ ও নিহত হয়েছেন। সভ্য মানুষের রীতি জানতেন আলেকজান্ডার, তাই পুরু-বিক্রমে খুশি হয়ে ক্ষমা করতে পেরেছেন তাঁকে— এই নীতির ধার ধারেনি মহম্মদ ঘোরি। ফল ভারতবর্ষের পরাধীনতা। তথ্যের ইতিহাস হিসাবে একথা প্রমাণ করতে চাইনি আমরা, আমাদের ঐতিহাসিকরা ধর্মনিরপেক্ষতার ভুল সত্যের সাধক। রবীন্দ্রনাথ গুরু গোবিন্দের মাধ্যমে তাঁর আদর্শ- সন্ধানী ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শিখ ইতিহাস রক্তে লিখেছে ভারত ইতিহাসের জ্যোতির্বলয়।

রাজপুত ইতিহাস : ভারতের প্রধান রাজশক্তিগুলি যখন শক ও হূণদের উপর্যুপরি আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন, নষ্ট উৎসন্ন হলো তখন রাজপুতদের আবির্ভাব। হতে পারে এরা আক্রমণকারীদেরই অপভ্রষ্ট উত্তরাধিকার। রবীন্দ্রনাথ তেমনি ভেবেছিলেন। এক সময় তাঁর চোখে এ ছিল আদর্শহীন সংঘাতের চিত্র : 'মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস-যবনিকা সবলে ছিন্ন করিয়া উদ্‌ঘাটন করিল তখন রাজপুত নামক এক আধুনিক সম্প্রদায় দেশের সমুদয় উচ্চ স্থানগুলি অধিকার করিয়া মান-অভিমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধে দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতে ছিল।' ('আধুনিক সাহিত্য'; রবীন্দ্র রচনাবলী; জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; কলকাতা; ১৯৬১; ১৩ 'শ খণ্ড; ৯৬১ পৃ.)। এর আগে পরে রবীন্দ্রনাথ রাজপুতদের রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় বা রমেশচন্দ্র দত্তের মতো আদর্শায়িত করে দেখেননি— তবে 'কথা' কাব্যে কয়েকটি কবিতায় রাজপুত জীবন-নীতিকে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুগত করে দেখিয়েছেন। কবিতাগুলি হলো :

১. 'মানী' (১ কার্তিক, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ); ২. 'রাজবিচার' (৪ কার্তিক, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ); ৩. 'নকল গড়' (৭ কার্তিক, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ); ৪. 'হোরি খেলা' (৯ কার্তিক, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ); ৫. 'বিবাহ' (১১ কার্তিক, ১০০৬ বঙ্গাব্দ); ৬. 'পণরক্ষা' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)।

মাত্র দু'মাসে ছ'টি কবিতা, একটিমাত্র ভূখণ্ডকে ঘিরে লেখার পিছনে কারণ সন্ধান কর্তব্য। এই লেখাগুলির বস্তু আহৃত হয়েছে টডের 'রাজস্থান' থেকে। (সূত্র : গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। কথা, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)।

রাজপুত-বীরত্বের আদর্শ কবিতাগুলির প্রতিপাদ্য। 'মানী'-র নায়ক অচলগড়ের রাজা সিরোহিপতি সুলতান-এর সঙ্গে আরঙজেব-এর প্রতি তুলনা এনেছেন কবি। আরঙজেব তখন ভারতবর্ষে জাতিসত্তাকে চূড়ান্ত অপমান করছেন— খণ্ড খণ্ড করে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করছেন। সেই উদ্যোগ রবীন্দ্র ভাষ্যে নেতিবাচক। তাঁর ভাষায় এ সেই সময় ঃ

'আওরঙজেব ভারত যবে
করিতেছিল খান-খান'

অন্য পক্ষে অচল গড়ের রাজা ভারতকে ঐক্যসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা, স্বাধীন থাকার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত।

'পাহাড়ি লয়ে কয়েকশত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে বড়
মরুভূমির মরীচিকার মতো
স্বাধীন ছিল রাজপুত'!

ততদিনে রাজপুতদের সঙ্গে পরিচয় সম্বন্ধ ঘটেছে মোগলদের। তাঁরা কেউ কেউ বিবাহসূত্রে রাজপুতদের আত্মীয়— এমন ঘটেছে। মাড়োয়াররাজ যশোবন্ত যেমন। চিতোররাজ রানা প্রতাপ এর বিপরীত। তিনি বশ্যতা স্বীকার করেননি। আমরণ স্বাধীনতা বজায় রেখেছেন। সিরোহি-র রাজা মানী ব্যক্তি— আরঙজেব তাঁর প্রতি যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করলেন। সকলে 'বজ্রনাদে' নির্দেশ দিলেন 'সেলাম করো বাদশা জাদে' কিন্তু রাজা সে আদেশকে তোয়াক্কা করলেন না। বললেন, 'গুরুজনের চরণ ছাড়া/ করিনে কারে প্রণিপাত।' একে ঔদ্ধত্য বলা যায় না। এ হলো চিরবস্তু— ভারতবর্ষ যা শত শত বৎসর ধরে লালন করেছে। পিতৃঘাতী-ভ্রাতৃঘাতী বর্বর ক্ষমতা লিপ্সা তার তল পাবে কী করে! অবশ্য আরঙজেব এই স্বাধীনচেতা 'অশনিভরা বিদ্যুৎ' পুরুষ সিংহকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'ভারত-মাঝে/ কী দেশ— 'পরে তব আশা?' রাজার উত্তর : 'অচল গড়'। কারণ তা 'দেশের সেরা জগৎ-'পর'। আরঙজেব তাঁর দাবি মেনে নিলেন।

'বাদশা কহে, 'অচল হয়ে
অচলগড়ে করো বাস'।

মনে হতে পারে এ আরঙজেবের মহত্ত্ব। তবে এর আড়ালে বন্ধুভাবাপন্ন মাড়োয়ার রাজের অনুরোধ আর সিরোহিপতির সঙ্ঘ শক্তির সঙ্গে কূটনীতির কিছু ভূমিকাও আছে।

অনতিস্ফুট আদর্শবাদ 'মানী' কবিতায় আওরঙজেবের ভূমিকায় সামান্য আচ্ছন্ন। তবে অন্য কবিতাগুলিতে তেমনি হয়নি। 'রাজ বিচার'-এ মাত্র আটটি পংক্তিতে একটি সুসংহত আদর্শ দ্যুতিমান হয়েছে। রাজা রতন রাও ব্রাহ্মণের কাছে শুনলেন তাঁর স্ত্রীকে বলাৎকার করতে উদ্যত যুবককে ধরে আনা হয়েছে। রাজবিচার ঘোষিত হলো 'মৃত্যু'। সহসা জানা গেল সেই চোর আসলে রাজার পুত্র— ব্রাহ্মণ তাকে আজ হত্যা করেছেন। সেই ব্রাহ্মণ এখন বন্দী। রাজবিচার ঘোষিত হলো 'মুক্তি'। ন্যায় বিচারের এই নিরাবেগ-নির্লিপ্ত-যুক্তি ভারতবর্ষের সাধনা। 'শেষ শিক্ষা'-য় গুরু গোবিন্দ সিংহ তাকে ব্যঙ্গ করে গেছেন।

'নকল গড়' কবিতাটি কিশোর পাঠ্য বলে পরিচিত। চিতোর রানা বুঁদির কেল্লা ধ্বংস না করে জলস্পর্শ করবেন না। এই অসম্ভব পণ তাঁর পূরণ করা মুশকিল। রাজা অনড়—

'কহেন রাজা, 'সাধ্য না হয়
সাধব আমার পণ'।

হারা-বংশী বীর রাজপুতদের বাস মাত্র তিন যোজন দূরে। তারা নিত্য বুঁদির কেল্লা পাহারা দিচ্ছে। পাত্রমিত্ররা মাটি দিয়ে নকল বুঁদিগড় নির্মাণ করলেন। রাজা তা মাটিতে মিলিয়ে দিন— এই অভিপ্রায়। কিন্তু রুখে দাঁড়ালেন হারা-বংশী কর্মচারী কুম্ভ। তাঁর কথা 'হারা-বংশী রাজপুত'-কে নতশির করার প্রতীকি ব্যাপারটি তিনি মানবেন না।

'নকল বুঁদি রাখব আমি
হারা বংশী বীর'।

তাঁর প্রতিরোধ যথেষ্ট গৌরবদীপ্ত। 'বুঁদির নামে করবে খেলা'— এ কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। ফল যা হবার তা-ই হলো। কুম্ভের একক প্রতিরোধ ব্যর্থ হলো। কিন্তু

'রক্তে তাহার ধন্য হলো
নকল বুঁদি গড়'।

আমরা এক ধ্বস্ত সময়ের অধিবাসী। পঞ্চম বাহিনী, শত্রু রাষ্ট্রের মানুষকে গুপ্তচর হিসাবে নিয়োগ আর সন্ত্রাসবাদীদের দেশ বিরোধী- জাতিদ্বেষী ব্যবহারের সঙ্গে আমরা পরিচিত।

এমন রাজনৈতিক দলও আছে যারা সংবিধান-গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বলে ইশতেহার ছাপে অথচ সংবিধান মেনে (নাস্তিক বলে ঈশ্বরের নামে শপথ না দিয়ে) গণতন্ত্রকে ভিতর থেকে ভেঙে দিতে চায়। রাজনৈতিক আদর্শ আর কৌশল তাদের— মিলে মিশে যায়। ট্রয়ের ঘোড়ার মতো এদের বিচিত্র কৌশল। আর তা-ই সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে দেখি সর্বত্র। এই পরিসরে 'কুম্ভ' বড়ই ব্যতিক্রমী। ব্যতিক্রমী তবে এসব অভিমনপুষ্ট ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষ করেছে।

'হোরিখেলা' কবিতাটিতে কৌশলী যুদ্ধের কথা আছে। এ অবশ্য চিরন্তন ভারতীয় উপাদান বলে আদর্শায়িত হয়নি কোনোদিন। কেতুন নগরের রাজা ভূনাগের রানি পাঠান নায়ক কেসর খাঁকে পত্র লিখে হোলিখেলার প্রস্তাব দিলেন। কোটা-র যুদ্ধে পরাজিত ভূনাগ। তিনি তখন কেতুনে অবস্থান করছেন। রানির শত দাসী রং সাজিয়ে এল। সহসা খেলার ধুন্ধুমারে কেসর খাঁকে আক্রমণ করলেন রানির ছদ্মবেশে রাজা— দাসীদের ঘাগরা ঝরে পড়ল, বের হলো যোদ্ধাবেশ।

'মন্ত্রে যেন কোথা হতে কে রে
বাহির হলো নারী-সজ্জা ছেড়ে,
এক শত বীর ঘিরল পাঠানেরে,
পুষ্প হতে একশো সাপের মতো'।

এল সহজবোধ্য।

'কেতুনপুরে বকুল-বাগানে
কেসর খাঁয়ের খেলা হলো সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা'।

হতে পারে এ কবিতা ইচ্ছা পূরণের। তবে যে শত্রু নীতিহীন বর্বর তার সঙ্গে নীতিসম্মত যুদ্ধের অর্থ জেনেশুনে মৃত্যুকে আহ্বান করা। তাই এই কৌশলী লড়াইয়ের আয়োজন। অবশ্য এমন রণকৌশল প্রয়োগ মধ্যযুগের ভারতে দেখা যায়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম শিবাজীর যুদ্ধ। যদি ভারত-জননী আরও কয়েকজন শিবাজীর জন্ম দিতেন ইতিহাস নিশ্চয় অন্যভাবে লেখা হত।

'বিবাহ' কবিতার আদর্শবাদ বীরাঙ্গনা মণিমালাকে ঘিরে। মর্তিয়া রাজপুত যুবকের সঙ্গে বিবাহের আসর থেকে মেত্রি রাজার ডাক পড়ে। যুদ্ধে অংশ নিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন রাজপুত্র। রাজকন্যা মণিমালা তার চিতায় আরোহণ করলেন। অনুমৃতা হলেন।

'শিয়র-'পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলের 'পরে থুয়ে।
নিশীথ-রাতে মিলন সজ্জা-পরা
মেত্রিপতি চিতার 'পরে শুয়ে'।

সাবিত্রী-মাদ্রী-বেহুলা যেমন, মণিমালাকে তেমনি পুরাণ-ছেঁড়া- আদর্শের নির্মাণ বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে সতীপ্রথা সমর্থন করতেন না বলেই মনে হয়। ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থকের পক্ষে তা সমর্থন করা সম্ভব নয়। 'কথা'তেই আছে 'ভক্তমাল' থেকে নেওয়া একটি কবিতা। 'স্বামীলাভ'। তুলসী দাস চিতারোহণে উদ্যত এক সতীকে নিবৃত্ত করে প্রশ্ন করেন 'হে জননী, স্বর্গ যাঁর, এ ধরণী ভূমি/ তাঁহারি কি নহে?' এরপর ওই নারী শুদ্ধাচারে স্বামীর সঙ্গে জগৎস্বামীর উপলব্ধি করলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ মণিমালার মাধ্যমে পদ্মিনী সহ শত সহস্র রাজপুত জননীর আত্মমর্যাদার স্বপ্ন বর্বর মুসলমান আক্রমণকারীর লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তির চির আদর্শটিকেই স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। এমন জননী জাতির পরম শ্লাঘার দান।

'পণরক্ষা' কবিতাটির মর্ম শিবাজীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত মারাঠা সৈন্যদের আক্রমণে আজমীর গড়ের দুমরাজ শাসক দুর্গাধিপতির বিধ্বস্ত হওয়ার কথা মাত্র নয়। শুধু 'মারাঠা দস্যু'-দের আক্রমণ হলেও দুমরাজ বিচলিত হতেন না। তিনি আঘাত পেলেন ভিতর থেকে। মাড়োয়ার-এর অন্তর্গত আজমীর দুর্গ; মাড়োয়ার রাজদূত মারফত খবর পাঠিয়েছেন--- গোয়ালিয়রের রাজ সিন্ধে আর ফিরিঙ্গি সেনাপতিদের হাতে দুর্গ ছেড়ে দিতে হবে। 'বিনা সংগ্রামে আজমীর গড়/ দিবে মারাঠার করে।' দুমরাজ একসময় শপথ করেছিলেন তিনি প্রাণ দিয়ে দুর্গ রক্ষা করবেন, শত্রুর হাতে বিনা প্রতিরোধে দুর্গাধিকার দেবেন না। আজ রাজাদেশ সেই শপথের বিপ্রতীপে দাঁড়াল। 'প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে' লাগল বিরোধ— শেষ পর্যন্ত দুর্গ দুয়ারে পড়ে থাকল তাঁর শব।

এক অর্থে দুমরাজকে এখানে নকলগড়ের কুম্ভের মতো মনে হয়। একা এক আদর্শ রক্ষার দুর্জয় সেনানী। পরাজয় অনিবার্য জেনেও আদর্শ রক্ষা—ভারতীয় সমাজজীবনে বহুদিন ধরে অনুশীলিত সত্য। মধ্যযুগের ঘনান্ধকার পরিবেশে এরকম সামান্য কিছু আলোর রেখা দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। দেখিয়েছেন। বলের প্রতাপের কৃতঘ্নতার বর্বর অস্ত্র ঝঞ্ঝনার মাঝখানে এইসব আলেয়া হ্রদ।

মারাঠা ইতিহাস : তথ্য পঞ্জীকরণ ইতিহাসের মাত্রা নয়। রবীন্দ্রমননে ভারত ইতিহাস একটি তাৎপর্য সন্ধান করতে চেয়েছে। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে বর্তমান লেখক একটি বই লিখেছেন— 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা'। সেখানে দেখিয়েছি ভারতবর্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে দেখবার চেষ্টা করেছে চিরকাল। এদেশের

ইতিহাস সেই ধর্মসম্মত রাষ্ট্রশক্তি বিকাশের ইতিহাস। যখন তা সার্থকতা পেয়েছে তখনই ভারত ইতিহাসের প্রভাব পড়েছে বিশ্ব ইতিহাসে— সময় পরিধিকে অতিক্রম করার সক্ষমতা এসেছে তখন। আর যখন তা আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট, তখন সেই 'রণরক্ত সফলতা'-কে ইতিহাস বলে গ্রাহ্য করেননি রবীন্দ্রনাথ।

'কথা'র এই কয়েকটি কবিতায় মারাঠাদের কথা আছে :

১. 'প্রতিনিধি' (৬ কার্তিক, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ); ২. 'বিচারক' (৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)।

এছাড়া স্বতন্ত্রভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা তিনি লিখেছেন; সেটি কোনো কাব্যে সন্নিবেশিত হয়নি— 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পেয়েছে। কবিতাটির নাম— 'শিবাজি উৎসব'। 'কাহিনী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা'-য় গুরু গোবিন্দ সিংহের নিষ্কাম ধর্ম সাধনার তাৎপর্য বিচার হয়েছে। সে তুলনায় 'শিবাজী উৎসব' অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। 'প্রতিনিধি'-তে আছে মারাঠা রাজশক্তির উত্থান পর্বের ধর্ম-নিষ্ঠার কথা, 'বিচারক'-এ আছে সেই রাষ্ট্রশক্তির ধর্ম-বিযুক্তির ইঙ্গিত। রবীন্দ্রনাথ এই ইতিহাস বোধ দ্বারা বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন। যতদিন রাষ্ট্র ধর্মসম্মত ততদিনই তার তাৎপর্য— যখন তা ধর্ম বিচ্যুত তখন তার তাৎপর্য নেই, স্মরণ যোগ্যতা নেই।

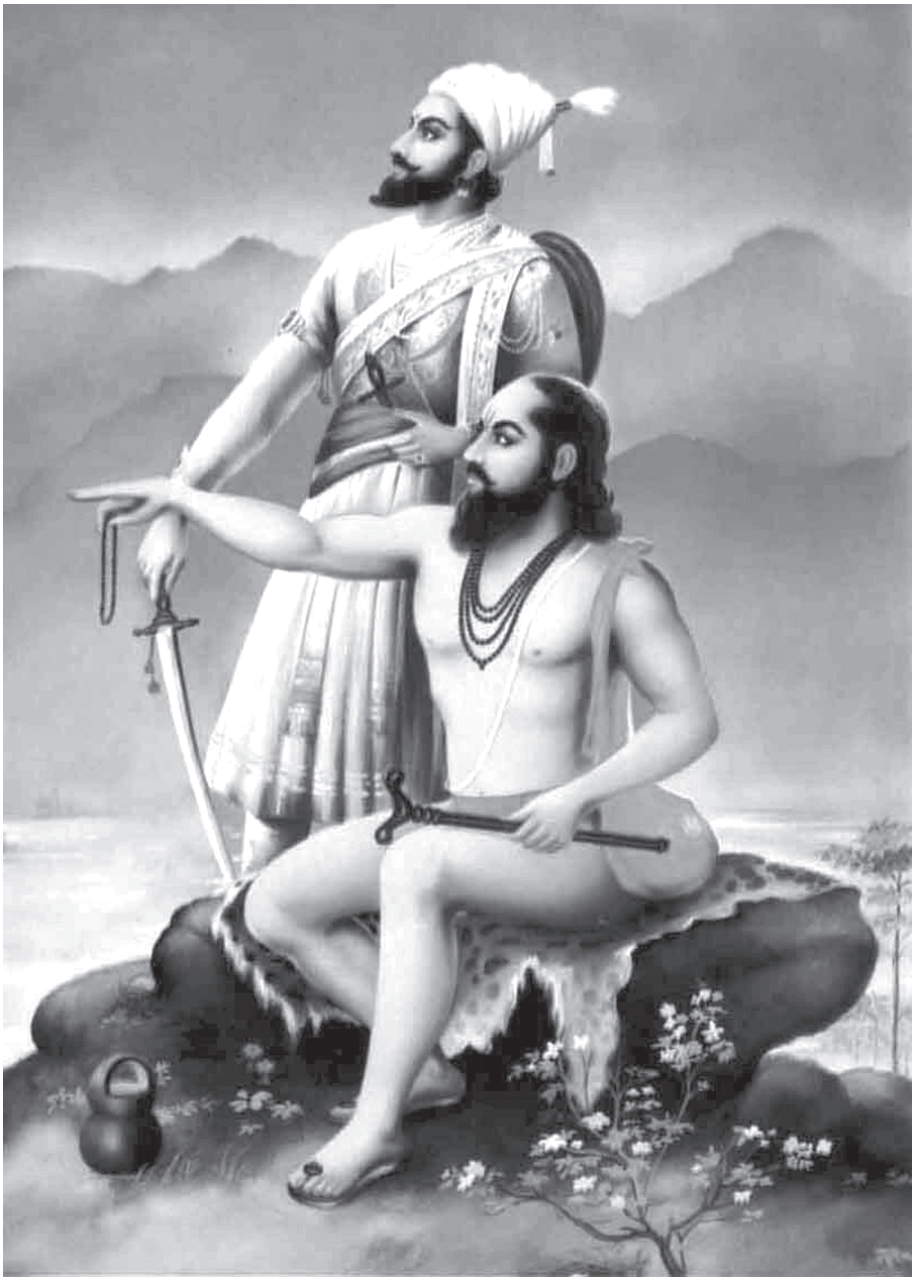

গুরু রামদাসের সঙ্গে শিবাজী।

শিবাজীর গুরু রামদাসের কথা আছে 'প্রতিনিধি' কবিতায়; আকওয়ার্থ-এর 'Ballads of the Marathas' থেকে নেওয়া এই কবিতার অন্তর্বস্তু। সেতারার দুর্গে শিবাজী দেখতে পেলেন তাঁর গুরু পথে পথে 'অন্নহীনে'-র মতো ভিক্ষা করছেন। তিনি বিস্মিত, বিমূঢ় হয়ত কিছু বিরক্ত, বিভ্রান্ত হয়ে বালাজীকে ডেকে একটি লিখন স্বাক্ষর করে দিয়ে আসতে বললেন। রামদাসকে সেই লিখন দান করলেন বালাজী। শিবাজী স্বাক্ষরিত দানপত্র : 'নিজরাজ্য রাজধানী' নিঃশর্তে দান করেছেন। শিবাজীকে পরদিন ডেকে নিলেন গুরু। বললেন—'চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।' শিবাজী এইভাবে রাজর্ষির ব্রতধারণ ও পালন করলেন। তাঁকে তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেন গুরু। শর্ত থাকল—

'মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।'

ভারতবর্ষ যুগে যুগে এরকম রামরাজ্যই পেতে চেয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ওয়েবার একে ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর ভারকেন্দ্র বলে সনাক্ত করেছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ও শূদ্রের দায়িত্ব ও কর্মবিভাজন— নিষ্কাম ব্রত পালন, গুণ ও কর্মের দ্বারা বর্ণ সংস্কার প্রাপ্তি— আদর্শ ভারতীয় সমাজ। কেউ

পায় সম্মান, কারো থাকে শক্তি, কেউ হয় ধনাধিকারী ও বাণিজ্যজীবী, কেউ শ্রমিক— পরস্পরে দৃঢ় নিবদ্ধ এক সমাজ সংঘট্ট। শক্তিমানের এই আত্মত্যাগের আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্র ধর্মকে অপরূপতা দান করেছে।

প্রায় কাছাকাছি সময় 'নৈবেদ্যে'র 'তপোবন' কবিতায় আছে সেই আদি আদর্শের কথা। কবিতাটির সময়-কাল ১৯ চৈত্র ১৩০২ বঙ্গাব্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষা : 'মনশ্চক্ষে হেরি তবে ভারত প্রাচীর/ পুরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ/মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।/ রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে/ অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নত শিরে/ গুরুর মন্ত্রণা লাগি'। বস্তুত এই নিরভিমান উদাসীনতাকে ভারতের শৌর্যহীনতা বলে জানে ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ সে ইতিহাসকে অতিক্রম করে চিরসত্যের সন্ধান করেছেন। ১ শ্রাবণ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ লিখলেন তিনি আর একটি সনেট— 'প্রাচীন ভারত'। 'নৈবেদ্যে'র সেই কবিতাকেও কবির কল্পনার গতি ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছে। 'অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী সেদিন 'উদ্ধত ললাট'। 'অসির ঝঞ্ঝা আর ধনুর টঙ্কারে' বীরত্বের মহতো মহীয়ান তখন শাশ্বত সুন্দর। কারণ রাজ্য রাজধানীর পাশেই আছে তপোবন। সেখানে 'নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার' জীবনচর্যা। এই ভারতবর্ষ— মহামানবের সাগরতীর।

'হেথা মত্ত স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা,
হেথা শান্ত মহা মৌন ব্রাহ্মণ মহিমা'।

শিবাজীর রাজর্ষি-বৃত্তি এই মহারাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিল।

'বিচারক' কবিতায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিচ্ছেদ লক্ষ্য করি। পেশোয়ারাজ রঘুনাথ রাও ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাও। সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার করার দাবি জানান ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী। কিন্তু 'মৈসুরপতি হৈদরালি'-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় ব্যস্ত রঘুনাথ রামশাস্ত্রী-র দাবি অমান্য করলেন। 'নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে'— এই তাঁর অহঙ্কার। ফল, ব্রাহ্মণ ন্যায়াধীনের দেশত্যাগ। 'বিচারশালার খেলাঘরে' আর তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে এখানেই মারাঠা ইতিহাস ভারত-ইতিহাসের তাৎপর্য থেকে সরে গেল। তারা হয়ে পড়ল দস্যুমাত্র। সে কেবল ঘটনার ঘনঘটা—

'আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধুলা
মারাঠি অশ্বখুরে'।

১১ ভাদ্র ১৩১১-র গিরিডি থেকে 'দেউস্কর মহশয়ের বৈদ্যুত তাড়নায় শিবাজি উৎসব' লিখে পাঠান রবীন্দ্রনাথ। (তথ্য সূত্র : 'চিঠিপত্র'; দশম খণ্ড; বিশ্বভারতী; আষাঢ় ১৪০২ বঙ্গাব্দ; ২৮ পৃ.)। কলকাতার মারাঠী বন্ধু সখারাম গণেশ দেউস্করের অনুরোধে বালগঙ্গাধর তিলক প্রতিষ্ঠিত শিবাজী উৎসব-আন্দোলনকে সমর্থন করে লেখা 'শিবাজী উৎসব'। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় এনেছেন বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের উদ্দীপিত জাতীয় চেতনা। একটা সময় ছিল মারাঠা সৈন্যদের আমরা ভয় পেয়ে বর্গীর হাঙ্গামার ত্রাস ও সংহারকেই শিবাজীর ইতিহাস বলে জানতাম। শিবাজীর ব্যক্তিত্ব, ধর্মপ্রাণতা, উচ্চ আদর্শ আমাদের কাছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে পৌঁছায়নি।

'সেদিনও শোনেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্র নির্ঘোষে
কী ছিল বারতা'।

পাশাপাশি, অন্য কারণও ছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শিবাজী ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন দস্যু, আর কিছু নয়।

'শিবাজী-উৎসব' এই ছদ্ম ইতিহাসকে সরিয়ে পুনর্গঠন করেছে অভিনব ইতিহাসবোধ। মিথ্যা রটনা কুশল 'ইতিবৃত্তকথা'-র পাশে আজ 'বিধাতার অব্যর্থ লিখন' জয়ী হচ্ছে। তাতে লেখা হচ্ছে শিবাজীর নতুন মহিমা।

'তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশ লক্ষ্মীর পূজা ঘরে
সে সত্যসাধন,
কে জানিত হয়ে গেছে চিরযুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন'।

—এই চিরবস্তু, ধর্ম ও রাজনীতির পবিত্র মেলবন্ধন— একেই রবীন্দ্রনাথ ভারতের ইতিহাস বলে জেনেছেন। এই ধ্রুব সত্যের দিকেই আমাদের জাতীয় অভিযাত্রা।।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

অউশভিৎসের বৈদ্যুতিক চুল্লী।

হলোকস্ট : ইয়োরোপে খৃস্টানদের ব্যাপক ইহুদী-নিধন যজ্ঞ

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

হলোকস্ট বলতে কি বোঝায়

এটা অনেকেরই জানা আছে যে, বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর নাৎসী সরকারের উদ্যোগে সমগ্র ইয়োরোপ জুড়ে ব্যাপক ইহুদী-নিধন হয়েছিল, যা হলোকস্ট নামে খ্যাত। এটাও অনেকের জানা আছে যে, জার্মানীর নাৎসীবাদ ছিল এক অতি উগ্র জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক মতবাদ। নাৎসীরা মনে করত যে, জার্মানরাই হল খাঁটি আর্য জাতি এবং পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট মানব গোষ্ঠী। এই কারণে অনেকেই মনে মনে এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, নাৎসীদের চোখে ইহুদীরা ছিল নিকৃষ্টতর এবং ঘৃণ্য এক মানব গোষ্ঠী এবং এই ধারণার দ্বারা চালিত হয়েই তারা ব্যাপক ইহুদী হত্যা করেছিল। অনেকে আবার মনে করেন যে, জার্মানীর অর্থনীতি ধীরে ধীরে ইহুদীদের করায়ত্ব হয়ে পড়ছিল এবং সেই কারণে নাৎসীদের নেতা হিটলার সমগ্র ইহুদী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেন। অনেকে আবার মনে করেন যে, ইহুদীরা বেশিরভাগ ছিল কুসীদজীবী এবং তারা অতিশয় উচ্চ হারে সুদে টাকা খাটাতো। এই কারণে তারা ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ঘৃণার শিকারে পরিণত হয় এবং এই ঘৃণাই ইহুদী নিধনের মূল কারণ হয়ে দেখা দেয়।

প্রকৃতপক্ষে এই সব ধ্যান-ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হলোকস্ট নামে খ্যাত ব্যাপক ইহুদী নিধন নাৎসীরা করেনি, করেছিল ইয়োরোপের খৃষ্টানরা। এই কাজে নাৎসীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল ঠিকই, তবে তারা নাৎসী হিসাবে নয়, খৃষ্টান হিসাবেই সেই ইহুদী হত্যা করেছিল। দ্বিতীয়ত, ঐ সময়কার ব্যাপক ইহুদী নিধনের প্রেরণা উগ্র নাৎসী জাতীয়তাবাদ থেকে আসেনি। বিগত প্রায় ২০০০ বছর ধরে ইয়োরোপের খৃষ্টান চার্চ ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা বিদ্বেষ প্রচার করে আসছিল, তা থেকেই হলোকস্টের প্রেরণা এসেছিল। তবে নাৎসীরা এই উদ্ভট ধারণা পোষণ করত যে, ইহুদীরা সমস্ত পৃথিবী দখল করার এক গোপন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাই ইহুদীদের নির্মূল

জার্মানির একচ্ছত্র শাসক ফ্যুরার অ্যাডলফ হিটলার।

করা দরকার এবং এই উদ্দেশ্য সফল করতে একটা প্রবল আর্য উত্থান প্রয়োজন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই ইয়োরোপের চার্চ প্রচার করতে শুরু করে যে, ইহুদীরা হল যীশু-বিদ্বেষী ও যীশু-বিরোধী। গড যীশুকে পাঠিয়েছিলেন ইহুদীদের পরিত্রাতা বা মেসায়া (Messiah) হিসাবে। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ইহুদীরা তাদের সেই পরিত্রাতার কথা তো শুনলোই না, বরং তাঁকে চরমভাবে অবজ্ঞা করলো, তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করলো এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রোমানদের হাতে ধরিয়ে দিল। অবশেষে তাদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে রোমান শাসক তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইহুদীদের প্রতি এই ঘৃণা-বিদ্বেষ বা অ্যান্টিসেমিটিজম (Anti-Semitism) প্রচার করার ফলে ইয়োরোপের খৃষ্টানদের মনে তৈরি হল ইহুদীদের প্রতি চরম ঘৃণা এবং এই তীব্র ঘৃণারই পরিণতি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার হলোকস্ট নামে খ্যাত ব্যাপক এবং বীভৎস ইহুদী গণহত্যা।

যাই হোক, ইংরাজী হলোকস্ট শব্দটি এসেছে গ্রীক হলোকসটাস থেকে। এখানে Holo শব্দের অর্থ হল সম্পূর্ণ বা সামগ্রিক এবং kaustos শব্দের অর্থ হল জ্বালিয়ে দেওয়া। এককালে গ্রীসে বিশেষ একটা প্রথা ছিল, তা হল দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশুকে জীবন্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে বা পুড়িয়ে দেওয়া এবং এই প্রথারই নাম ছিল হলোকসটাস। এই হলোকস্ট শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দ হল শোয়াহ্ (Shoah)। কালে চরম বিপর্যয়, চূড়ান্ত ধ্বংস, ব্যাপক নরহত্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই হলোকস্ট শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে।

বিগত ১২শ শতাব্দীতে রিচার্ড অফ ডিভাইজেস নামে বৃটেনের একজন পাদ্রী ও লিপিকার (chronicler) সর্বপ্রথম তাঁর রচনায় হলোকস্ট শব্দটি ব্যবহার করেন। পরে ১৭শ শতাব্দীতে স্যার টমাস ব্রাউন নামে একজন দার্শনিক তাঁর গ্রন্থ *উম ব্যারিয়াল*-এ হলোকস্ট শব্দটি ব্যবহার করেন। এরপর থেকে ইংরাজী ভাষায় হলোকস্ট শব্দটি ব্যাপক গণহত্যা চিহ্নিত করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হতে থাকে। পরে ১৯৬০ সাল থেকে হলোকস্ট শব্দটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীদের নেতৃত্বে ইয়োরোপের ব্যাপক ইহুদী নিধনকে বোঝাতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিগত ১৯৭৮ সালে হলোকস্ট নামে একটি টিভি সিরিয়ালের মাধ্যমে এই ব্যাপক ইহুদী হত্যা পাশ্চাত্যের জনসাধারণকে দেখানো হয় এবং সেই থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও হলোকস্ট শব্দটি শুধু খৃস্টানদের ইহুদী নিধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তাই বর্তমানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইয়োরোপে, নাৎসীদের নেতৃত্বে, খৃষ্টানরা যে ব্যাপক ইহুদী হত্যা করেছিল, সেই ব্যাপক নরহত্যাকে হলোকস্ট বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে হিব্রু শব্দ শোয়াহ্ বলতে বোঝায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ব্যাপক ধ্বংস। তবে বর্তমানে শোয়াহ্ ইয়োরোপের ব্যাপক ইহুদী নিধন বা হলোকস্টের সমার্থক হিসাবে পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হলোকস্টের বীভৎসতা ও ব্যাপকতা

এটা অনেকেরই জানা আছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নির্দেশে নাৎসী নামে পরিচিত তার দলের লোকেরা পাইকারী দরে ইহুদী হত্যা করেছিল। কিন্তু কত ইহুদী সে সময় মারা পড়েছিল তা সম্ভবত জানা নেই। ঐতিহাসিকদের মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইয়োরোপে বসবাসকারী ইহুদীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ লক্ষ এবং এই ৯০ লক্ষ ইহুদীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হিটলারের নির্দেশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই ইহুদী-নিধন যজ্ঞ শুধু জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সেই সময় জার্মানী ইয়োরোপের যে সমস্ত দেশ জয় করেছিল, সেই সব দেশেও তা প্রসারিত হয়েছিল। এব্যাপারে স্মরণ করা যেতে পারে যে, যেই শহরে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে সর্বাপেক্ষা অধিক ইহুদী হত্যা করা হয়েছিল, সেই শহরের

আউশভিৎস বন্দী শিবির বা বধ্যভূমি।

নাম ছিল আউশভিৎস এবং তা পোল্যাণ্ডে অবস্থিত। হিটলারের এই ব্যাপক ইহুদী নিধনকে ঐতিহাসিকরা বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ও বৃহৎ গণহত্যা বলে মনে করে থাকেন। এই গণহত্যা ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত জারি ছিল।

যাই হোক, ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ইহুদীদের চিহ্নিতকরণ এবং এক সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে তাদের পাইকারী হারে হত্যা করার ঘটনা চলেছিল। যদিও ইহুদীরাই ছিল এই ব্যাপক গণহত্যার প্রধান শিকার, তবে ইয়োরোপের অন্য অনেক জনগোষ্ঠীও এই হলোকস্টে প্রাণ হারিয়েছিল এবং নাৎসীদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। জার্মানি নাৎসী সরকার বা থার্ড রাইখ-এর সকল উচ্চপদস্থ অফিসাররা কোনো না কোনোভাবে এই মর্মান্তিক ইহুদী গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইহুদী ছাড়া আর যাদের এই গণহত্যায় সামিল করা হয়েছিল তারা হল, যাযাবর বেদে বা জিপসীরা, পোলান্ডের অধিবাসী বা পোলরা, কমিউনিস্টরা, সমকামীরা, রাশিয়ার যুদ্ধবন্দীরা এবং মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে অক্ষম ব্যক্তিরা। এই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। কাজেই ৬০ লক্ষ ইহুদী আর ৫০ লক্ষ এই সমস্ত লোক মিলে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক মারা পড়েছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, এদের মধ্যে ১০ লক্ষ ইহুদী শিশু ছিল। হত্যার সমগ্র প্রক্রিয়াটা ধাপে ধাপে করা হয়েছিল। প্রথম ধাপ হিসাবে জার্মান সরকার কিছু আইন জারি করে, যার মধ্যে প্রধান ছিল ১৯৩৫ সালের নুরেমবার্গ আইন। এইসব আইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ নাগরিকদের থেকে ইহুদীদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা এবং আলাদা করা। এই জন্য ইহুদীদের জামা কাপড়ে বাধ্যতামূলক ভাবে হলুদ রঙের ডেভিডের নক্ষত্র অঙ্কিত করার আইন চালু করা হয়। দ্বিতীয়ত, তাদের জন্য বিশেষ বস্তি বা ঘেট্টো তৈরি করা এবং সমস্ত ইহুদীদের বলপূর্বক ঐসব ঘেট্টোতে নিয়ে যাওয়া। ১৯৩৩ সাল থেকেই নানা জায়গায় বন্দী শিবির বানানো শুরু হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এই সব কাজ অতিশয় ত্বরান্বিত হয়। ১৯৪২ সালের মধ্যে জার্মানি এবং অন্য সমস্ত দেশে প্রায় ৪২,৫০০টি বিশেষ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল, যাদের মাধ্যমে ইহুদী ও অন্যান্য লোকদের চিহ্নিত করে একসঙ্গে জড়ো করে আটক করা হয়েছিল এবং অবশেষে হত্যা করা হয়েছিল। সব মিলে ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ লোককে এই সব কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

১৯৪১ সালে জার্মানি পূর্ব ইওরোপের অনেক অঞ্চল জয় করে। তখন আইনসাৎগ্রুপেন নামক জার্মান বাহিনীর একটি বিশেষ শাখাকে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলা হয় ইহুদী নিধনের কাজে ব্যবহার করার জন্য। এই বিশেষ বাহিনী ১৯৪১-৪২ সালে প্রায় ২০ লক্ষ ইহুদীকে গুলি করে হত্যা করে। ১৯৪২ সালের মধ্যেই বহু জায়গায় বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে পাইকারি হারে ইহুদী হত্যার জন্য বিশেষ ক্যাম্প বা বধ্যভূমি গড়ে তোলা হয়। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে শুরু হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে মালগাড়ির ওয়াগনে করে ইহুদীদের নিয়মিতভাবে ওইসব বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা। যেভাবে পশু পরিবহন করা হয় তার চেয়েও নির্দয়ভাবে ইহুদীদের নিয়ে আসা হতো এবং যারা এই অমানুষিক যাত্রা সত্ত্বেও টিকে যেত তাদের গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে মেরে ফেলা হতো। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত এইসব ক্যাম্পগুলিতে ইহুদী হত্যা চলতে থাকে। নাৎসীরা তাদের এই ব্যাপক ইহুদী নিধনকে খাতা-কলমে কখনো হলোকস্ট অথবা ইহুদী হত্যা বলতো না, বলতো ইহুদী সমস্যার অন্তিম সমাধান Final solution to the Jewish Question । জার্মান ভাষায় যাকে বলা হোত Endlosung der Judenfrage। তবে স্বল্প কথায় একে শুধু অন্তিম সমাধান বলা হোত। এব্যাপারে তারা আরও একটা চাতুরির সাহায্য নিত। সরাসরি ইহুদী শব্দ ব্যবহার না করে তারা বলতো বেঁচে থাকার অযোগ্য লোকেরা। এই সব শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তারা তাদের সেই জঘন্য অপরাধকে আড়াল করতে বা যুক্তিযুক্ত মনে করতে চেষ্টা করত।

আগেই বলা হয়েছে যে, জার্মানির নাৎসী সরকার বা থার্ড রাইখ-এর সমগ্র পরিকাঠামোটাকেই এই ইহুদী নিধনযজ্ঞে সামিল করা হয়েছিল। এই কারণে বিশিষ্ট হলোকস্ট বিশেষজ্ঞ মাইকেল বেরেনবম এই থার্ড রাইখ সরকারকে গণহত্যার সরকার বা

মৃতদের জুতোর স্তূপ।

Genocidal State আখ্যা দিয়েছেন। এব্যাপারে জার্মানির খৃষ্টান চার্চ হিটলারের নাৎসী সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। প্রথমত, চার্চ সাধারণ নাগরিকদের থেকে ইহুদীদের সনাক্তকরণ ও পৃথককরণে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছিল। প্রত্যেক আঞ্চলিক গীর্জাতেই সমস্ত নাগরিকদের জন্মবৃত্তান্ত নথিভুক্ত করা থাকতো এবং সেই নথি থেকে গীর্জার পাদ্রীরা কে ইহুদী আর কে ইহুদী নয় তা সরকারকে জানিয়ে দিত। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট, উভয়ই এই কাজে সমানভাবে লিপ্ত হয়েছিল। এইসব নথির উপর ভিত্তি করেই জার্মান সরকার ইহুদীদের নিজস্ব বাসস্থান থেকে উৎখাত করার চিঠি দিত এবং নাৎসী সরকারের বিত্তমন্ত্রক ইহুদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত। উপরন্তু এইসব নথির ভিত্তিতেই জার্মানির কল-কারখানার মালিকরা ব্যাপকভাবে ইহুদী কর্মী ছাঁটাই করত এবং সরকার ইহুদী শেয়ার মালিকদের ভোট দেবার অধিকার ছিনিয়ে নিত।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, নাৎসী সরকারের আমলে জার্মানি এবং জার্মান অধিকৃত ইওরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ইহুদীরা কতখানি অসহায় হয়ে পড়েছিল এবং কত নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। তারা আরও কত রকমের ঘৃণা ও বিদ্বেষের শিকার হয়েছিল তা কয়েকটা উদাহরণ দিতে বুঝতে সুবিধা হবে। সেইসময় জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইহুদী ছাত্রদের ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং যে সমস্ত ইহুদী শিক্ষাবিদ সেখানে পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাদের চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এইসব ছাত্র ও শিক্ষকদের মালগাড়ির ওয়াগনে করে দূরবর্তী বন্দীশালা ও বধ্যভূমিগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জার্মানির ওষুধ কোম্পানিগুলিকে ক্যাম্পের এইসব ইহুদীদের ওপর যে কোনোরকমের ওষুধ পরীক্ষা করার ঢালাও অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সারা জার্মানিতে ও জার্মানির অধিকৃত দেশগুলোতে ইহুদীদের মৃতদেহ দাহ করার চুল্লি তৈরির হিড়িক পড়ে গিয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, আঞ্চলিক গীর্জাগুলিতে যে নামের তালিকা ছিল তা থেকে জার্মানির নাৎসী সরকার ইহুদীদের সনাক্ত করতে এবং নামের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যারা মারা পড়েছিল সেই ৬০ লক্ষ লোকের তালিকা বা হিসাব কিভাবে রাখা হয়েছিল? এই কাজের জন্য সেই সময়কার অত্যাধুনিক কারিগরি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ডিহোম্যাগ নামক একটি কম্পিউটার কোম্পনিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই ডিহোম্যাগ কোম্পানি ছিল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কম্পিউটার কোম্পানি আই বি এম-এর জার্মান শাখা এবং একটা বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে তারা হতভাগ্য ইহুদীদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করেছিল। যখনই কোনো ইহুদীকে বধ্যভূমিতে আনা হত, তখন তাকে তার সমস্ত সম্পত্তি সরকারকে সমর্পণ করতে বাধ্য করা হোত। জার্মানি ছাড়া অন্য কোনো দেশের ইহুদীর বেলায় তার সম্পত্তি জার্মানীর সম্পত্তিতে পরিগণিত হোত।

জার্মানির রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে নামবিহীন বিশেষ একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হোত এবং সেইসব সম্পত্তি ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র সেই অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত রাখা হোত।

এই সমস্ত অত্যন্ত অমানবিক ও দস্যুসুলভ কাজকর্মের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট ইহুদী লেখক ও চিন্তাবিদ সল ফ্রেডল্যান্ডার বলেন যে, সেই সময় জার্মানি তথা ইওরোপের কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় সংগঠন অথবা কোনো পেশাদারি সংস্থা নির্যাতিত ইহুদীদের পাশে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করার সাহস দেখায়নি। সেই ভয়ঙ্কর দিনে প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেক ইহুদী রাতারাতি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কারণ আগে বলা হয়েছিল, যেসব ইহুদী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবে, তাদের প্রাণে মারা হবে না। কিন্তু পরে আর তা মানা হয়নি। তখন খৃষ্টীয় চার্চ ঘোষণা করল যে, যেসব ইহুদী সম্প্রতি খৃষ্টান হয়েছে বা যাদের ঠাকুর্দা ঠাকুমারা এবং দাদু দিদিমারা অন্তত পক্ষে ১৮ জানুয়ারি, ১৮৭১ সালের আগে খৃষ্টান হয়নি, তারা ইহুদী হিসাবেই পরিগণিত হবে। শ্রী ফ্রেডল্যান্ডার খৃষ্টান চার্চের এই নীতিরও কঠোর সমালোচনা করেন।

এই অবসরে শ্রী সল ফ্রেডল্যান্ডারের সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা সমীচীন হবে। বিগত ১৯৩২ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরের একটি জার্মানভাষী ইহুদী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ফ্রান্সে তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন এবং জার্মানি ফ্রান্স দখল করার পর হিটলার সেখানে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত যে দমন-পীড়ন চালায়, শ্রী ফ্রেডল্যান্ডার ছিলেন তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত শ্রীফ্রেডল্যান্ডার একটি রোমান ক্যাথলিক গীর্জার গোপন আস্তানায় লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। তাঁর পিতা-মাতা সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু পথে ধরা পড়ে যান। নাৎসীরা তাঁদের আউশভিৎস-এ পাঠিয়ে দেয় এবং সেখানে গ্যাস চেম্বারে তাঁদের মারা হয়। ১৯৪৬ সালে শ্রী ফ্রেডল্যান্ডার তাঁর পিতা-মাতার এই করুণ পরিণতির কথা জানতে পারেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, হলোকস্ট নামে পরিচিত এই সামগ্রিক ইহুদী-নিধন সুনির্দিষ্ট প্রথা অনুসারে জার্মানি ও জার্মান অধিকৃত ইওরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। বর্তমান ভৌগোলিক বিন্যাস অনুসারে ইয়োরোপের ৩৫টি দেশে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯৩৯ সালে মধ্য ও পূর্ব ইওরোপে ৭০ লক্ষ ইহুদী বসবাস করতো এবং সেখানেই এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড চরমে পৌঁছায় এবং প্রায় ৫০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে পোলান্ডের ৩০ লক্ষ ও রাশিয়ার ১০ লক্ষ ইহুদী ছিল। বাকিরা ছিল নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের ইহুদী। বিশেষজ্ঞদের মতে, নাৎসীরা এই ব্যাপক ইহুদী হত্যাকে বৃটেন এবং কয়েকটি নিরপেক্ষ দেশ, যেমন আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, সুইডেন, পর্তুগাল এবং স্পেনেও ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয়নি।

বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা ইহুদী হত্যা

হলোকস্ট-এর ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় হল, বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে পাইকারি দরে মানুষ হত্যা করা। জার্মানি ও ইওরোপের অনেক স্থানে এই বিশেষ ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই দিক থেকে বিচার করলে একে অভিনব না বলে উপায় নেই। কারণ এর আগে পৃথিবীর কোথাও মানুষ খুন করার এই রকম নারকীয় ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল বলে জানা যায় না। যে সমস্ত জায়গায় মানুষ খুনের জন্য গ্যাস চেম্বার স্থাপন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পোলান্ডের আউশভিৎস, বেলজেক, কেলমনো, জাসেনোভাচ, মাজডানেক, মালি ট্রসটানেৎস, সবিবর এবং ট্রেবিঙ্কা।

অনেক পাঠকের মনেই কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক যে, যে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে মারা হয়েছিল, সেটা কি গ্যাস ছিল? সেই গ্যাসটি ছিল একটি সায়ানাইড ঘটিত যৌগ, যার বাণিজ্যিক নাম ছিল Zyklon B। প্রাথমিকভাবে পোকা মারার ওষুধ হিসাবে এটি বাজারে ছাড়া হয় এবং নাৎসীরা একে মানুষ মারার কাজে ব্যবহার করে। সায়ানাইড ঘটিত এই পোকা মারার ওষুধ বা পেস্টিসাইডটি ১৯২০ সালের প্রথমদিকে জার্মানিতে আবিষ্কৃত হয়। এতে অত্যন্ত বিষাক্ত হাইড্রোজেন সায়ানাইড (বা প্রুসিক অ্যাসিড) ব্যবহৃত হোত। ১৮৮০ সালে আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া রাজ্যে এই হাইড্রোজেন সায়ানাইড সর্ব প্রথম লেবু জাতীয় গাছের পোকা মারার ওষুধ বা পেস্টিসাইড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরে জার্মানির বিজ্ঞানীরা Zyklon-এ নামে হাইড্রোজেন সায়ানাইডের একটি মিশ্রণ আবিষ্কার করে এবং এই Zyklon-এ-কে গরম করলে বা জলে ফেললে এর থেকে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস নির্গত হোত। বিপদের বহুল সম্ভাবনা থাকার জন্য জার্মানিতে Zyklon-এ-র তৈরি ও বিক্রি বেআইনি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই Zyklon-এ-কে কিছু এদিক ওদিক করে সেই গ্যাসকে জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। হাইড্রোজেন সায়ানাইড ঘটিত বিষ প্রথমে মানুষের শ্বসনতন্ত্রকে আক্রমণ করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। কাজেই আক্রান্ত ব্যক্তি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়। ৬৮ কিলোগ্রাম ওজনের একজন মানুষের মধ্যে মাত্র ৭০ মিলিগ্রাম হাইড্রোজেন সায়ানাইড প্রবেশ করলে দু'মিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটবে।

বিগত ১৮শ শতাব্দীতে হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯শ শতাব্দীতে, ১৮৮০ সালে তা সর্বপ্রথম আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া রাজ্যে ব্যবহৃত হয়। সেখানে প্রথম হাইড্রোজেন সায়ানাইড যুক্ত ধোঁয়া দিয়ে লেবু জাতীয় গাছের পোকা মারা হয় এবং পরে সেই ধোঁয়ার সাহায্যে শস্যাগার, মালগাড়ির ওয়াগন, জাহাজ এবং কলকারখানাকে জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করা হয়। সেই গ্যাস নিয়ে গবেষণা করার জন্য ১৯১৯ সালে জার্মানির কাইজার উইলহেলম ইন্সটিটিউট অব ফিসিক্যাল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্রি-এর অধিকর্তা ফ্রিৎস হেবার-এর প্রচেষ্টায় এবং সরকারের সহায়তায় Deutsche Gesellschaft fur Schadlingsbekampfung (সংক্ষেপে Degesch) গবেষণাগার স্থাপিত হয়। এই গবেষণাগারের প্রধান কাজ ছিল হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাসের সামরিক প্রয়োগের বিষয়টা খতিয়ে দেখা।

ডা: জোশেফ মেঙ্গেল

এই গবেষণাগারেই প্রথম Zyklon A এবং পরে Zyklon B তৈরি করা হয়। এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, উপরিউক্ত Zyklon A জার্মানি বিগত প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও রাসায়নিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানিতে যত Zyklon B তৈরি হোত তার প্রায় সবটাই বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায় রপ্তানি করা হোত। তখন মার্কিন সরকারের গণস্বাস্থ্য বিভাগ মালগাড়ি এবং মেক্সিকো থেকে আগত আমেরিকায় প্রবেশকারী অভিবাসীদের জামা-কাপড় জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করতো। জার্মানিতেও মালগাড়ি, জাহাজ, গুদামঘর ইত্যাদিকে জীবাণুমুক্ত করতে Zyklon B ব্যবহৃত হোত।

যাই হোক, ১৯২২ সালে জার্মানির বিজ্ঞানী ও গবেষকরা হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাসকে কেনেস্তারা টিনে ভর্তি করে স্থানান্তরে চালান করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। কিছু কিছু কঠিন বস্তু আছে, যারা হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাসকে শোষণ করে নেয়। পরে ওই কঠিন বস্তুগুলোকে গরম করলে বা জলের সংস্পর্শে আনলে তা থেকে হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস পৃথক হয়ে যায়। কাজেই ওই সব শোষক বস্তুর মধ্যে হাইড্রোজেন সায়ানাইড শোষণ করিয়ে কেনেস্তরা টিনে করে সহজেই স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া চলে। বিশেষ কোনো কঠিন বস্তুতে হাইড্রোজেন সায়ানাইড শোষণ করিয়ে Zyklon B তৈরি করা হোত।

হলোকস্টের সময় সেই কেনেস্তরা টিনে সীল করে এভাবেই হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাসযুক্ত Zyklon B আউশভিৎস ও অন্যান্য বন্দী শিবিরে নিয়ে আসা হোত এবং ইহুদী ও অন্যান্য বন্দীদের উপর প্রয়োগ করা হোত। ওই সময় বন্দী শিবিরগুলিতে ইহুদী বন্দীদের বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার ব্যাপারে ১৯৪২ সালের প্রথমদিক থেকেই Zyklon B নাৎসীদের কাছে প্রিয় হয়ে দেখা দেয়। নাৎসীরা সরকারি নথিপত্রে কখনো Zyklon B লিখত না। তারা একে ইহুদীদের পুনর্বাসনের ব্যবহার্য জিনিস লিখত। শুধু এই বিষ প্রয়োগ করেই আউশভিৎস বন্দী শিবিরে কমপক্ষে দশ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে জার্মানিতে মোট ৭২৯ মেট্রিক টন Zyklon B বিক্রি হয়, যার মধ্যে ৫৬ মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট বিক্রির প্রায় ৮ শতাংশ বন্দী শিবিরগুলিতে মানুষ মারার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৯৪২ সাল থেকেই ইহুদী বন্দীদের বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে মারার জন্য বন্দী শিবিরগুলিতে বিশাল বিশাল গ্যাস চেম্বার তৈরি করা শুরু হয়ে যায়। ছোট চেম্বারগুলিতে একসঙ্গে ৭০০-৮০০ মানুষ মেরে ফেলা যেত এবং সবথেকে বড় চেম্বারগুলিতে একসঙ্গে ১৭০০ থেকে ১৮০০ মানুষকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা ছিল। গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে ২০ মিনিট গ্যাস প্রয়োগ করলেই সব মানুষ মারা যেত। সেই সঙ্গে তৈরি করা হয় মৃতদেহগুলি পুড়িয়ে ফেলার জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি। সেই সব চুল্লিতে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার পর যে ছাই পড়ে থাকত, তা নদীতে ফেলে দেওয়া হোত বা জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা হোত। এইসব বৈদ্যুতিক চুল্লির বেশিরভাগই নাৎসীরা তাদের দুষ্কর্মের নিদর্শন লোপাট করার নীতি হিসাবে বোমা মেরে ভেঙে দেয়। তবুও কিছু চুল্লি এখনও অটুট অবস্থায় থেকে গিয়েছে। তবে সুখের কথা হল, ২৬ অক্টোবর, ১৯৭৯ ইউনেস্কো আউশভিৎসকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষণা করার ফলে বর্তমানে আর কোনো চিহ্ন লোপাট করা সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য মৃতদেহগুলিকে গণকবরও দেওয়া হোত। এই সব কাজ কত ব্যাপকভাবে করা হোত একটা উদাহরণ দিলে তা বুঝতে সুবিধা হবে।

ইওরোপের যে যে দেশ বা তার অংশবিশেষ জার্মানি দখল করেছিল, তার সমস্ত জায়গা থেকেই পশু বহন করার ওয়াগনে করে ইহুদীদের পোল্যান্ডের বন্দী শিবিরগুলিতে নিয়ে আসা হোত। জার্মানি হাঙ্গারি দখল করার পর শুধু সেখান থেকেই প্রতিদিন প্রায় ৭০০ ইহুদী নিয়ে আসা হোত। রেলগাড়ি থেকে

নামানোর সঙ্গে সঙ্গে এস এস বা Schutzstaffel নামে পরিচিত আধা সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাদের সক্ষম ও অক্ষম এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলত। কর্মক্ষম যুবকদের সক্ষম বলে চিহ্নিত করা হোত এবং তাদের দিয়ে বন্দী শিবিরগুলিতে পরিশ্রমের কাজ করিয়ে নেওয়া হোত। এছাড়া বাকি সবাইকে অক্ষম বলে চিহ্নিত করা হোত। এই অক্ষমদের দলে থাকতো বয়স্ক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, নারী ও শিশুরা। অক্ষম বলে চিহ্নিত এই সব হতভাগাদের তখনই গ্যাস চেম্বারে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হোত। আসল উদ্দেশ্য গোপন করে তাদের বলা হোত যে রেলে এত দূর আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে, তাই চান-টান করে একটু ফ্রেশ হয়ে নেওয়া যাক। এই বলে তাদের গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হোত এবং গ্যাস চেম্বারে ঢোকানোর পর তাদের গায়ে জামা-কাপড় খুলে ফেলার হুকুম দেওয়া হোত। এরপর বাইরে থেকে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করা হোত এবং ২০ মিনিটের মধ্যে সকলেই মারা যেত। আগেই বলা হয়েছে যে, এইসব মৃতদেহগুলি কখনো বৈদ্যুতিক চুল্লিতে জ্বালিয়ে ফেলা হোত অথবা গণকবর দেওয়া হোত। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রতিদিন বেশ কয়েক হাজার বন্দীকে মেরে ফেলার এবং মৃতদেহগুলি পোড়াবার বা গণকবর দেবার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান ঐতিহাসিকদের অনুমান, আউশভিৎসের এই বধ্যশালায় ২৭টি দেশ থেকে নিয়ে আসা ১৬ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল যার মধ্যে ১১ লক্ষ ইহুদী, ১ লক্ষ ৫০ হাজার পোলান্ডবাসী এবং ২৩ হাজার ভবঘুরে জিপসী (বেদে) ছিল। কাজেই সেই অনুপাতে বিষাক্ত গ্যাস Zyklon B শিবিরগুলিতে নিয়ে আসার বা সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল।

মাইকেল বেরেনবম

ডেগেশ নামে একটি জার্মান কোম্পানি এই Zyklon B তৈরি করত। ১৯৪৩ সালে এই কোম্পানি যত টাকার ব্যবসা করেছে তার ৬৫ শতাংশ এসেছে Zyklon B বিক্রি করে। Zyklon B যারা আবিষ্কার করেছিল তাদের মধ্যে একজনে নাম ছিল ব্রুনো টেশ। সে জানত যে এই বিষ নাৎসীরা মানুষের উপর প্রয়োগ করবে। তা সত্ত্বেও ওই বিষ এস এস-কে সরবরাহ করার অপরাধে সে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং ১৯৪৬ সালে বৃটেনের যুদ্ধকালীন অপরাধের বিচারালয় তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। যদিও বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে হাইড্রোজেন সায়ানাইড তৈরি করা নিষিদ্ধ হয়েছে বা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও চেকোস্লোভাকিয়ার একটি কোম্পানি (Detia Degesch) এখনও তা তৈরি করে চলেছে।

দুই জন ঐতিহাসিকের অভিমত

এর আগেও পৃথিবীতে অনেক জায়গায় ব্যাপক নরহত্যা হয়েছে, যেমন বিদেশি মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা ভারত দখল করার সময় ব্যাপক হিন্দু হত্যা। অথবা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক হিন্দু হত্যা। এইসব নরহত্যার উদ্দেশ্য ছিল কোনো অঞ্চল বা কোনো দেশ জয় করা এবং সেখানকার সম্পদ দখল করা। কিন্তু হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসীরা যে ব্যাপক ও সামগ্রিক ইহুদী হত্যার পরিকল্পনা করেছিল এবং তা কার্যে পরিণত করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ইসরাইলের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইয়েহুদা বয়ার (জন্ম ১৯৬২) লিখেছেন, হলোকস্টের ব্যাপারে যে প্রধান অভিপ্রায় কাজ করেছিল, তা ছিল এক কাল্পনিক মতবাদ, যা নাৎসীদের এক মায়াময় কাল্পনিক জগতের মূলে অধিষ্ঠিত ছিল। তারা মনে করতো ইহুদীরা সারা পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত করছে, যাকে কেবলমাত্র আরেকটা সমান্তরাল আর্য মতবাদের সাহায্যেই রুখে দেওয়া সম্ভব। এর আগে যতবার যত ক্ষেত্রে কোনো জাতির মানুষকে হত্যা করে নির্মূল করা হয়েছে তার কোনো ক্ষেত্রেই এরকম কোনো সম্পূর্ণ মিথ্যা বা মতিভ্রম বা বাহ্যিক বা অপরিণত বা অবাস্তব মতবাদকে ভিত্তি করে হয়নি।

এই হলোকস্টের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে জার্মান ঐতিহাসিক এবারহার্ড জ্যাকেল লিখছেন, হলোকস্টের ব্যাপারে লক্ষণীয় বিষয় হল, এর আগে কোনো রাষ্ট্র বা তার সরকার বা তার দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন কোনো নেতা ঘোষণা করেনি যে কোনো একটি বিশেষ মানব গোষ্ঠীকে তার বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, মহিলা, নাবালক, নাবালিকা ও শিশুসহ যত শীঘ্র সম্ভব হত্যা করতে হবে এবং সেই ঘোষণাকে যত প্রকারে সম্ভব রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কার্যে পরিণত করেছে।

ইহুদী বাচ্চাদের গিনিপিগ-এর মতো ব্যবহার করার কাহিনী

হলোকস্ট নামক এই বিশাল নরমেধ যজ্ঞের আর একটা বিশেষত্ব ছিল। তা হল হতভাগ্য ইহুদী ও তাদের ছেলেমেয়েদের উপর নানা ধরনের ওষুধপত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো। জার্মান ডাক্তার রল হিলবার্গ-এর মতে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত জার্মানদের থেকে জার্মান ডাক্তাররা নাৎসীদের খুবই অনুগামী হয়ে পড়েছিল। এইসব ডাক্তাররা আউশভিৎস, দাকাউ, বুকেনোয়াল্ড, র‍্যাভেনসব্রুক, সাস্কেনহাউসেন এবং ন্যাৎসওয়েলার ইত্যাদি বন্দী

শিবিরগুলিতে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতো।

এইসব ডাক্তারদের মধ্যে ওশভিৎস-এ কর্মরত ডা: জোসেফ মেঙ্গেল ছিল সবথেকে নির্দয় ও দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি। তার পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে ছিল বন্দীদের অতি উচ্চচাপের চেম্বারে ঢুকিয়ে রাখা, তাদের উপর নানারকম ওষুধের পরীক্ষা চালানো, তাদের অত্যন্ত শীতল কক্ষে বসিয়ে রাখা, তাদের চোখের রঙ বদলাবার ছল করে চোখে নানারকম ওষুধ ইনজেক্ট করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ দেওয়া ও বহুরকমের ভয়াবহ ও কাল্পনিক সার্জিক্যাল অপারেশন করা। ডা: জোসেফ মেঙ্গেল তার এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল কাইজার উইলহেলম ইন্সটিটিউট-এর ডা: ওৎমার ফন ফরশুয়ের কাছে পাঠাতো। সেইসব রিপোর্টে কি ছিল আজ আর তা জানার উপায় নেই। কারণ ট্রাক বোঝাই সেই সব রেকর্ড ডা: ফরশুয়ের জ্বালিয়ে নষ্ট করে দিয়েছেন। যেসব বন্দী ডা: মেঙ্গেলের পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও বেঁচে যেত তাদের তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলা হোত।

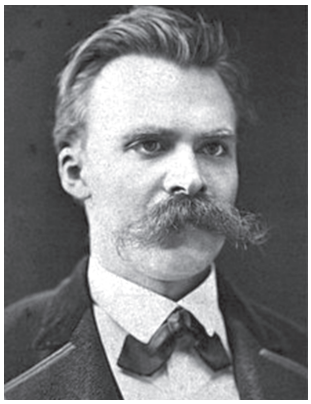

ফ্রেডেরিক নীৎসে

ডা: মেঙ্গেল তার পরীক্ষা নিরীক্ষা বিশেষ করে ভবঘুরে বেদেদের বাচ্চাদের উপর চালাতো। তাদের ভোলাবার জন্য সে তাদের খেলনা ও লজেন্স দিত। গ্যাস চেম্বারে মারার সময় সেও তাদের সঙ্গে চেম্বার অবধি যেত। আউশভিৎসে ভেরা আলেকজান্ডার নামে একজন ইহুদী বন্দী ছিল। সে বেদেদের ৫০ জোড়া যমজ বাচ্চার দেখাশোনা করত। পরবর্তীকালে ভেরা একটা ঘটনার কথা খুব বলতো। সে বলতো, আমার মনে পড়ছে সেই এক জোড়া যমজ বাচ্চার কথা, যাদের নাম ছিল গুইডো এবং ইনা। একদিন ডা: মেঙ্গেল পরীক্ষা-নিরীক্ষার নাম করে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। যখন তাদের সে ফেরত নিয়ে এল তখন তাদের বীভৎস দৃশ্য ছিল কল্পনাতীত। ডা: মেঙ্গেল তাদের পিঠে পিঠে লাগিয়ে সেলাই করে দিয়েছে। দেখতে মনে হচ্ছিল যেন পিঠে পিঠে লাগানো একজোড়া সিয়ামিজ জমজ বাচ্চা। তাদের পিঠের ক্ষত তখন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তা থেকে পুঁজ ঝরছিল। তারা ব্যাথায় দিবারাত্র চিৎকার করত। আমি তার বাবা-মাকে চিনতাম। তার নাম ছিল স্টেলা। সে কোথা থেকে কিছুটা মরফিন জোগাড় করে তাকে খাইয়ে দিল, যাতে করে মরে গিয়ে সে সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

ডা: মেঙ্গেল ১৯১১ সালে জার্মানির বাভারিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে। ১৯৩৭ সালে সে নাৎসী পার্টিতে এবং ১৯৩৮ সালে এস এস-এ যোগ দেয়। পরে তাকে ইহুদী বন্দী শিবিরগুলিতে এবং ১৯৪৩ সালে তাকে আউশভিৎস-এ পাঠানো হয়। ব্যক্তিগতভাবে জীন বিজ্ঞানের প্রতি ডা: মেঙ্গেলের বিশেষ রুচি ছিল এবং এব্যাপারে তার কিছু কিছু মনগড়া, বিশেষ করে যমজ বাচ্চাদের ব্যাপারে, অলীক ধারণা ছিল। এই কারণেই বন্দীদের ৫০ জোড়া জমজ বাচ্চার উপর সে তার উদ্ভট ধ্যান-ধারণাগুলিকে যাচাই করার সুযোগ পায় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, তার ধ্যান-ধারণাগুলি ছিল সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং তার পরীক্ষা- নিরীক্ষাগুলি ছিল অবৈজ্ঞানিক তো বটেই, তাছাড়া চূড়ান্ত অমানবিক। মনে হয়, জীন বিজ্ঞানের কোনো এক অলীক ধারণার বশবর্তী হয়েই সে দুটো যমজ বাচ্চার পিঠে পিঠে সেলাই করেছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, উপরিউক্ত এস এস হলো জার্মান শব্দ Schutzstaffel (শুৎসস্টাফেল)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই শুৎসস্টাফেল ছিল হিটলার তথা তার নাৎসী পার্টির অধীন একটি আধা সামরিক বাহিনী। এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, নাৎসী পার্টির প্রকৃত নাম ছিল ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি (বা Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) এবং সংক্ষেপে NSDAP। এর মধ্যে ন্যাশনাল সোস্যালিজম্-এর জার্মান শব্দ হল ন্যাশনালসোৎসিয়ালিসমাস এবং এরই সংক্ষিপ্ত রূপ হলো Nazi বা নাৎসী। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে, জার্মান ভাষায় আমাদের বাংলা ও সংস্কৃতের মতো সন্ধির প্রচলন আছে। যাই হোক, বিগত ১৯২০ সালের শেষের দিকে মিউনিকে সাল শুৎস নামে ছোট্ট একটা ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয়। তখন এর কাজ ছিল নাৎসী পার্টির জনসভায় নিয়মশৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করা। পরে ১৯২৫ সালে হাইনরিখ হিমলার এই সাল শুৎস-এ যোগ দিয়ে এর কিছু রদবদল করে এর নাম দিল শুৎসস্টাফেল। হিমলার ১৯২৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই সংস্থার সর্বেসর্বা ছিল এবং তার চেষ্টায় এই শুৎসস্টাফেল ছোট্ট একটি আধা-সামরিক বাহিনী থেকে পৃথিবীর একটি বৃহত্তম এবং থার্ড রাইখের অধীন একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত হয়। নাৎসী পার্টির মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই এস এস বা শুৎসস্টাফেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের আদেশে অনেক অত্যন্ত অমানবিক কাজকর্ম ও ভয়ানক যুদ্ধাপরাধ করে। ১৯৪৫ সালের পর আন্তর্জাতিক সামরিক ন্যায়পীঠ নাৎসী পার্টির সঙ্গে সঙ্গে এই শুৎসস্টাফেলকেও নানারকম যুদ্ধাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সোভিয়েত রাশিয়ার

রেড আর্মি আউশভিৎসে পৌঁছাবার কয়েকদিন আগে ডা: মেঙ্গেল জার্মানি ত্যাগ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে যায়। পরে ১৯৪৯ সালে সে আর্জেন্টিনায় পালিয়ে যায় বুয়েনস আয়ার্সে বাস করতে থাকে। ইজরাইলের গুপ্তচর বাহিনী মোসাড-এর চোখে ধুলো দেবার জন্য সে ১৯৫৯ সালে প্যারাগুয়ে এবং ১৯৬০ সালে ব্রাজিলে পালিয়ে যায়। শেষে ১৯৭৯ সালে ব্রাজিলের উপকূলে সমুদ্র স্নান করতে গিয়ে ডাক্তাররূপী এই নরদানব জলে ডুবে মারা যায়।

ইহুদীদের উপর এইসব জঘন্য অত্যাচার ও নিপীড়নের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের বিখ্যাত দার্শনিক শ্রী ফ্রেডেরিক নীৎসে বলেন, ইহুদীদের যে সমস্যার কথা বলা হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে একটি জাতিগত সমস্যা। কারণ ইহুদীরা তাদের কর্মশক্তি ও উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি, তাদের বংশপরম্পরা দ্বারা সঞ্চিত উদ্যম ও জীবনীশক্তি এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি, শিক্ষার প্রতি তাদের প্রবল আগ্রহ এবং নানাবিধ অন্যায় ও অত্যাচার সত্বেও দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রবল প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠার ফলে অন্যান্য জাতির লোকেদের সামগ্রিক হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছিল। সেই কারণে সমসাময়িক অন্যান্য সকল জাতির লোকেরা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে তাদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য ইহুদীদের বলির পাঁঠা সাব্যস্ত করা বিস্তার লাভ করতে শুরু করল এবং তারা ইহুদীদের হত্যা করতে আরম্ভ করল।

নীৎসের উপরিউক্ত মন্তব্যের সমর্থনে এবিষয়ে দু-একটি কথা বলা সঙ্গত হবে। বর্তমান পৃথিবীতে ইহুদীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ০.০২ শতাংশ। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে, এই ইহুদীরা বিগত ২০০০ বছর ধরে ধর্মীয় নির্যাতন ও দমন পীড়নের শিকার হয়ে আসছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এই নিপীড়িত ইহুদীদের মধ্যে আজ পর্যন্ত মোট ১২৯ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যাতেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ৫৩ জন। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এই ইহুদী বিজ্ঞানীরাই হলেন পদার্থবিদ্যার সর্বাধুনিক শাখা কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর জন্মদাতা।

ইহুদী বনাম মুসলমান

এব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদীদের একটা তুলনামূলক আলোচনা করা চলতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১২০ কোটি। অর্থাৎ প্রতি একজন ইহুদীর জন্য রয়েছে ১০০ জন মুসলমান। এই ১২০ কোটি মুসলমানের মধ্যে আজ পর্যন্ত নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন মাত্র ৭ জন। সাহিত্যে ১ জন, শান্তির জন্য ৪ জন এবং চিকিৎসা বিদ্যা বা মেডিসিনে ২ জন। এর মধ্যে পদার্থবিদ্যায় পাকিস্তানের বিজ্ঞানী আব্দুস সালামকে ধরা হয়নি, কারণ তিনি আহমদীয়া গোষ্ঠীর লোক ছিলেন এবং সেই কারণে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেছে যে তিনি মুসলমান নন।

এখানে আরও বলা সঙ্গত হবে যে, ইহুদীরা তাদের বাচ্চাদের জিহাদি তৈরি করার জন্য সামরিক শিক্ষা দেয় না বা আত্মঘাতী হয়ে বোম বিস্ফোরণ করে বা সুইসাইড বোম্বার হয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা করতে শিক্ষা দেয় না। ইহুদীরা কখনো বিমান ছিনতাই করে না, কখনো অন্য ধর্মের মানুষের উপাসনাস্থল, গীর্জা বা মন্দির ধ্বংস করে না, বা প্রতিবাদ করার নিমিত্ত নিরীহ মানুষ খুন করে না। তারা মুসলমানদের মতো নারী জাতিকে বোরখা দিয়ে ঢেকে বা গৃহবন্দী করে রাখে না। মুসলমানদের মতো তারা বলে না যে, ইহুদী ছাড়া অন্য সমস্ত জাতির লোককে সামগ্রিকভাবে হত্যা করে সারা পৃথিবীতে ইহুদীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্টা করতে হবে। ইহুদীরা কখনো ক্রীতদাসের ব্যবসা করে না বা ক্রীতদাসত্বকে সমর্থন করে না। সম্ভবত এই সব কারণেই মুসলমানদের চোখে ইহুদীরা হল পৃথিবীর নিকৃষ্টতম প্রাণী বা জন্তুবিশেষ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয়ে দু-একটি কথা বলা সঙ্গত হবে। ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে ইহুদীরা হলো আল্লার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য এক মানব গোষ্ঠী। কোরান বলছে যে, আল্লা খৃষ্টানদের জন্য রবিবার, ইহুদীদের জন্য শনিবার এবং মুসলমানদের জন্য শুক্রবারকে বিশ্রামের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই খৃষ্টানরা রবিবার এবং মুসলমানরা শুক্রবার কাজ না করে বিশ্রাম করে। সেই অনুসারে ইহুদীদেরও শনিবার কাজ না করে বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু একবার হলো কি, কোনো এক শনিবার সমুদ্র উপকূলে প্রচুর মাছ ভেসে এল। মুসলমানদের চোখে ইহুদীরা ছিল খুব লোভী প্রকৃতির মানুষ। তাই তারা লোভের বশে আল্লার আদেশ অমান্য করে শনিবার সত্ত্বেও মাছ ধরতে শুরু করল। কিন্তু আল্লা তাদের ওপর বেজায় চটে গেলেন এবং শাস্তি হিসাবে তাদের কাউকে বানর আর কাউকে শুয়োর করে দিলেন। কাজেই মুসলমানদের দৃষ্টিতে ইহুদীরা কেউ বাঁদর কেউ বা শুয়োর। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এই উপাখ্যানের মূলেও রয়েছে ইহুদীদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ। এক কথায়, মুসলমানদের চোখে ইহুদীরা বানর বা শুয়োর মাত্র।

নবী মহম্মদের ইহুদী বিদ্বেষ

ইসলামের প্রবর্তক নবী মহম্মদ ৬২২ খৃষ্টাব্দে হিজরৎ করে যখন মদিনায় এলেন তখন সেখানে বেশ কয়েকটি উপজাতির ইহুদীরা বসবাস করত। এদের মধ্যে প্রধান ছিল কানুইকা, নাজির ও কুরাইজা উপজাতির ইহুদীরা। মদিনার এইসব ইহুদীরা ছিল ধনী। সমস্ত উর্বর জমি জায়গা ও ধন-সম্পত্তি ছিল এই ইহুদীদের

করায়ত্ব। দরিদ্র আরবরা এইসব ইহুদীদের খামারে দিনমজুরের কাজ করত। প্রথমে মহম্মদ চেষ্টা করলেন এই ইহুদীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে এবং যখন দেখলেন যে ইহুদীরা কোনোমতেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করতে নারাজ, তখন তাদের মদিনা থেকে তাড়িয়ে ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা করলেন। প্রথমে শুধু ভয় দেখিয়ে নজির ও কানুইকা ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করলেন। তারপর ৬২৬ খৃষ্টাব্দে কুরাইজা ইহুদীদের নির্মম গণহত্যা সংঘটিত করলেন। ৮০০ সক্ষম সাবালক পুরুষকে তরোয়াল দিয়ে ধড় মুণ্ডু আলাদা করা হলো। যেসব বালকের যৌন কেশ দেখা গিয়েছিল তাদের সাবালক বলে গণ্য করা হয়েছিল। ১০০০ যুবতী নারী ও শিশুকে ভোগের সামগ্রী হিসাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়েছিল এবং বয়স্ক মহিলাদের ক্রীতদাসী হিসাবে নেজদে অবস্থিত ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা এখানে বলে রাখা উচিত। মদিনার ধনী ইহুদীদের আর একটি আয়ের উৎস ছিল তেজারতির কারবার এবং গরিব আরবরা এই সব ইহুদীদের থেকে প্রয়োজনে সুদে টাকা ধার নিত। এই আয় থেকে বঞ্চিত করার জন্যই ইসলামে সুদ নেওয়া হারাম বা পাপ নীতি গৃহীত হয় এবং এর ফলে আরবদের বিনা সুদে টাকা ধার করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। যাই হোক, এই ঘটনা দার্শনিক নীৎসের অনুমানকেই সত্য বলে প্রমাণিত করে।

আল্লা সব সময় মুসলমানদের মনে ইহুদীদের প্রতি ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে রাখছেন এবং বলছেন ইহুদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মুসলমানরা সব সময় বিজয়ী হবে। ওমর বর্ণিত একটি হাদিস বলছে যে, জিহাদের সময় কোনো ইহুদী কোনো পাথরের পিছনে লুকিয়ে থাকলে সেই পাথর মুসলমানদের ডেকে বলবে যে, দেখ আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। তোমরা এসো এবং তাকে হত্যা কর (বোখারি - ৩৫৯৩)।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হিটলারের নেতৃত্বে ইওরোপের ব্যাপক নিধন সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে আনন্দে উৎফুল্ল করে তোলে। আনন্দের আতিশয্যে জেরুজালেমের প্রধান মুফতি হজ আমিন আল-হুসেইনিকে প্রতিনিধি হিসাবে জার্মানিতে পাঠানো হয় হিটলারকে বাহ্‌বা দেবার জন্য। মুফতি হজ আমিন আল-হুসেইনিকে জার্মানিতে পাঠানোর পিছনে আরও একটা কারণ ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষকে ইংরাজিতে এক কথায় অ্যান্টিসেমিটিজম বলা হয়। কিন্তু হলোকস্টের মতো বীভৎস ঘটনা যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন বেশ কিছু খৃষ্টান ইহুদীদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ল। তারা যুক্তি দেখাতে থাকল, যদি ইহুদী না থাকে তবে খৃষ্টধর্মও থাকবে না, কারণ যীশু এবং তাঁর বাবা-মা ইহুদী ছিলেন, বাইবেল রচয়িতাদের মধ্যে ৯০ শতাংশ কি তারও বেশি ব্যক্তি ইহুদী ছিলেন এবং বর্তমান খৃষ্টধর্মের মধ্যে ইহুদী রীতিনীতি, জীবনবোধ ও সামাজিক নিয়মকানুন এত নিবিড়ভাবে মিশে রয়েছে যে তাকে বাদ দেওয়া বা বর্জন করা এক অসম্ভব কাজ। ইহুদীদের প্রতি এই সহানুভূতিশীলতাকে বলে জিওনিজম এবং এই সহানুভূতিশীল লোকদের বলে জিওনিস্ট। আমেরিকা ও বৃটেনের খৃষ্টানদের মধ্যেই জিওনিস্টদের সংখ্যা ছিল বেশি।

এই জিওনিস্টরা তখন বলতে শুরু করল যে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের একটা নিজস্ব দেশ দরকার। তারা প্রচার করতে শুরু করল, এককালে যে কান্নান দেশ গড তাদের প্রদান করেছিলেন, সেই কান্নান দেশেই তাদের একটা হোমল্যান্ড তৈরি করে দেওয়া হোক। মিত্রশক্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আমেরিকা ও বৃটেন জিওনিস্টদের এই দাবি সমর্থন করল এবং বলল যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে আগেকার অটোমান তুর্কিদের অধিকৃত প্যালেস্টাইন, ইরাক ও লেবাননের অংশ বিশেষ একত্র করে ইহুদীদের জন্য নতুন রাষ্ট্র ইসরাইল গঠন করা হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হল না। যেই মধ্যপ্রাচ্যে তাদের একাধিপত্য সেই মধ্যপ্রাচ্যেই পাকাপাকিভাবে তাদের চিরশত্রু ইহুদীদের বসতভূমি তৈরি করে দেওয়া হবে, তা তারা কোনোমতেই সহ্য করতে পারল না। ইহুদীদের শত্রু একমাত্র হিটলারই পারে আমেরিকা ও বৃটেনের এই পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে। তাই মুফতি হজ আমি আল-হুসেইনির জার্মানি সফর করার অন্য উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে মিত্রশক্তির ইসরাইল প্রকল্পের বিরোধিতা করতে অনুরোধ করা।

ইহুদীদের গণ-প্রতিরোধ

অনেকে ইহুদীদের নামে এই অপবাদ দেন যে, ছাগলের খোঁয়াড় থেকে কসাইরা যেমন পাঁঠা ও খাসিকে ধরে নিয়ে বলি দেয়, ইহুদীরাও সেইরকম বিনা প্রতিবাদে নাৎসীদের মারণ খোঁয়াড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁরা বলেন, কেন ইহুদীরা হাতিয়ার হাতে তুলে নেয়নি, বাধা দেয়নি? তাঁরা এটা লক্ষ্য করেন না যে, হাতিয়ার হাতে নেওয়া বা বিদ্রোহ করাটা তখন কত কঠিন কাজ ছিল। যদি কোনা ইহুদী একজন নাৎসীকে হত্যা করত তবে এস এস-এর লোকেরা ৫০ কি ১০০ ইহুদীর পুরো দলটাকেই তৎক্ষণাৎ গুলি দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিত। অনেকে বলেন, তারা বন্দী শিবিরগুলি থেকে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু পালিয়ে কোথায় যেত? যেখানে সমস্ত লোকালয় ছিল ইহুদী বিদ্বেষী বা অ্যান্টিসেমিটিক, সেখানে পালিয়ে যাওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। স্থানীয় ভাষা জানা না থাকায় পালিয়ে গিয়ে কোনো গ্রামে আশ্রয় নেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া একজন

এইসব ইহুদী শিশুদের ওপর বিভিন্ন ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়।

পালালে হয়তো তার পরিবার পরিজন সহ ১০০ কি তারও বেশি মানুষকে মরতে হোত। তবে প্রাণ রক্ষার তাগিদে বহু ইহুদী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। অনেক জায়গায় যেখানে সম্ভব ছিল সেখানে ইহুদীরা দলবদ্ধভাবে গণপ্রতিরোধও গড়ে তুলেছিল। এমনকী সেই সময় ইওরোপের অনেক জায়গায় ইহুদীরা খুনি নাৎসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সংঘটিত করে।

এই সশস্ত্র সংগ্রামগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে পোল্যান্ডের ওয়ারশ নগরে অবস্থিত ইহুদী ঘেট্টোর লোকদের সশস্ত্র উত্থান। প্রায় বেশ কয়েক হাজার ইহুদী সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নাৎসী বাহিনীকে বাধা দেয় এবং প্রায় দু'সপ্তাহ তাদের অগ্রগতি স্তব্ধ করে রাখে। সমগ্র পূর্ব ইয়োরোপে ২০ থেকে ৩০ হাজার ইহুদী নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষ করেছিল। এব্যাপারে ফ্রান্সের ইহুদীরা ছিল খুবই সক্রিয়। তারা নাৎসী বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাত। নাৎসীদের ঠেকাতে সারা ইওরোপে ইহুদীরা সব মিলিয়ে প্রায় শতাধিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটায়।

এই ইহুদী অভ্যুত্থানের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে ১৯৪৩ সালের ১৪ অক্টোবর পোল্যান্ডের সবিবর বন্দী বা মারণ শিবিরে। প্রথমে গুপ্তভাবে এই অভ্যুত্থান শুরু হয় এবং ইহুদীরা ১১ জন এস এস অফিসারকে এবং আরও কিছু রক্ষীকে হত্যা করে। সেই শিবিরে প্রায় ৬০০ বন্দী ছিল। যার মধ্যে প্রায় ৩০০ জন পালাতে সক্ষম হয়। পরে ৫০ থেকে ৭০ জন ধরা পড়ে যায় এবং তাদের শিবিরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর এস এস এস প্রধান হেনরিখ হিমলারের আদেশে প্রমাণ লোপের উদ্দেশ্যে জার্মান বাহিনী শিবিরের সমস্ত ঘরবাড়ি বুল্ডোজার দিয়ে ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। পরে খালি জমিতে গাছ লাগিয়ে দেয়।

যাই হোক, সবিবরের এই ঘটনার ওপর ১৯৮৭ সালে বৃটিশ চিত্র পরিচালক জ্যাক গোল্ড 'এসকেপ ফ্রম সব্বির' নামে একটি ছবি তৈরি করেন। উৎসাহী পাঠক ইন্টারনেটে এই ছবিটি দেখতে পারেন।

হলোকস্টের মূল কারণ চরম অজ্ঞতা

আগেই বলা হয়ে যে, হলোকস্ট নামক ব্যাপক ইহুদী হত্যার মূলে ছিল খৃষ্টানদের ইহুদী বিদ্বেষ বা অ্যান্টিসেমিটিজম্, এবং এই অ্যান্টিসেমিটিজম-এর মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, ইহুদীরা যীশুকে হত্যা করেছিল। প্রথম দিকে খৃষ্টানদের এই ইহুদী বিদ্বেষের নখ বা দাঁত কিছুই ছিল না। কারণ তখন খৃষ্টানরা নিজেরাই ছিল অতি নগণ্য এক সংখ্যালঘু মানব গোষ্ঠী। কিন্তু ৩১২ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করা এবং খৃষ্টধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করার পর চিত্রটা রাতারাতি বদলে যায়। কারণ খৃষ্টানরা পেয়ে গেল রোমান সাম্রাজ্যের মতো এক বিশাল সাম্রাজ্যের আর্থিক, সামরিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা। তখন থেকেই শুরু হলো ইহুদীদের ওপর ধর্মীয় অত্যাচার ও নির্যাতন, যাকে ইংরাজিতে বলে রিলিজিয়াস পার্সিকিউশন। কিন্তু ইহুদীরা যীশুকে হত্যা করেছিল এই ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

তবে একথা ঠিক যে, ইহুদীরা যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং যখন তাঁর বিচার হচ্ছিল সেখানে তারা খুব জোরের সঙ্গে যীশুর প্রাণদণ্ড দাবি করেছিল। তাদের সেই জোরালো দাবির কাছে নতি স্বীকার করেই জুডিয়ার রোমান শাসক পন্টিয়াস পাইলেট যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার আদেশ দেয়। যীশু নিজেকে ইহুদীদের রাজা বলে দাবি করতেন এবং এই অপরাধেই তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

যীশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হল তখন তিনি যন্ত্রণায় খুব কাতর হয়ে পড়লেন এবং তা দেখে তাঁর শিষ্যগণ ও ভক্তগণ খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁরা পন্টিয়াস পাইলেটের স্ত্রীর কাছে উপস্থিত হলেন। পন্টিয়াস পাইলেটের স্ত্রীর প্রকৃত নাম কি ছিল খৃষ্টান গ্রন্থাদিতে তার বিশেষ উল্লেখ নেই।

পরবর্তীকালে গ্রন্থাদিতে কোথাও তাঁকে সেন্ট প্রোকুলা, আবার কোথাও সেন্ট ক্লডিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মহীয়সী যীশুর খুব ভক্ত ছিলেন এবং সবার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি যীশুর জন্য একটি আরক তৈরি করালেন। অনেকে মনে করেন যে, ওই আরকে আফিম ব্যবহার করা হয়েছিল। একটি পাত্রে করে সেই আরক বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটা লাঠির সঙ্গে পাত্রটিকে বেঁধে আরক যীশুকে খাইয়ে দেওয়া হয়। যাই হোক, সম্ভবত আফিম থাকার জন্য আরকটা খাবার পর যীশু জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এবং তাঁর মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়ে। প্রহরীরা তখন চিৎকার করতে থাকে যে, যীশু মারা গিয়েছেন, যীশু মারা গিয়েছেন। তখন তাদের মধ্যে একজন যীশুর পায়ে বর্শা দিয়ে খোঁচা মারে। যীশু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন বলে মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ করেননি, তবে তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হয়। তাই জার্মান যীশু-বিশেষজ্ঞ হোলগার কারস্টেন-এর মতে, যীশু তখন জীবিত ছিলেন। কারণ মরা মানুষ থেকে কখনও রক্তপাত হয় না।

যাই হোক, যীশু মারা গেছেন মনে করে প্রহরীরা তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে দেয় এবং যীশুর শিষ্যরা অতি সত্বর তাঁকে একটা গুপ্তস্থানে নিয়ে যায়। দুই দিন শুশ্রুষা করার পর যীশু সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং শিষ্যদের দেখা দেন। এই ঘটনাই পুনর্জন্ম নামে খ্যাত। তারপর যীশুকে চোরাপথে ভারতে আনা হয় এবং এই ঘটনার অনেক বছর পর কাশ্মীরের শ্রীনগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

এইসব তথ্যাদি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুর মৃত্যু হয়নি। কাজেই ইহুদীরা যীশুকে হত্যা করেছে এই অপবাদ সর্বৈব মিথ্যা। তাই ইহুদী বিদ্বেষ বা অ্যান্টিসেমিটিজম-এর মূল কারণটাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অথচ এই অলীক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে খৃষ্টানরা বিগত প্রায় ২০০০ বছর ধরে ইহুদীদের ধর্মীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়ে এসেছে। সর্বোপরি হলোকস্টের মতো ব্যাপক ইহুদী নিধন সংঘটিত করেছে। অথচ সত্য ইতিহাস জানা থাকলে এর কিছুই ঘটত না।

তবে সুখের কথা হলো, এত নির্মম দমন-পীড়ন সত্ত্বেও ইহুদীরা আজকেও টিকে আছে। তাদের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার দ্বারা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর জাতিদের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে এবং ১২৯টি নোবেল পুরস্কারের মালিক হয়েছে। প্রায় ২০০০ বছর যাযাবরের মতো কাটিয়ে আজ তারা তাদের মাতৃভূমি ইজরাইলকে ফিরে পেয়েছে। এর ফলে তাদের অগ্রগতি যে আরও ত্বরান্বিত হবে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

কণিকার স্বপ্ন

শেখর বসু

রাতে কী স্বপ্ন দেখবে দিনের বেলায় বলে দিতে পারত কণিকা। আর অবাক কাণ্ড, রাতে গভীর ঘুমের মধ্যে ঠিক সেই স্বপ্নটাই ও দেখত। স্বপ্ন দেখার কারণটা খুব পরিষ্কার ছিল ওর কাছে। বলত, যা আমার ভালো লাগে তাই নিয়ে ভাবি, ভাবতেই থাকি। বোধহয় অত ভাবি বলে সব কিছু আমার স্বপ্নের মধ্যে চলে আসে। এই স্বপ্ন আর ভাবাভাবির মধ্যে দিনের অনেকটা সময় দিব্যি মজে থাকত কণিকা।

এইভাবে কিছুকাল চলার পরে ওর স্বপ্নের এলাকা আরও খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা হলে সেই জায়গাটার কথা ও ভাবতে শুরু করে দিত। পাঁচজনের মুখে শোনা কথা

নিয়ে ভাবনা নয়, পুরো ব্যাপারটাই নিজের মতো করে ভাবা।

পাহাড়ি এলাকা হলে সেই পাহাড়টা ও দেখতে পেত। পায়ে চলা সরু পথ কীভাবে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গিয়েছে, গাছপালা কেমন সবই দেখতে পেত পরিষ্কার। বেড়াবার জায়গা সমতল হলেও ক্ষতি নেই, ও সেখানকার ছবিও স্পষ্ট দেখতে পেত। ছবির মতো দেখা। কালো রাস্তার ঠিক পাশেই লাল টালি-ছাওয়া বাংলো, বাংলোর পেছনে বাগান, কাছেই ঘাটবাঁধানো পুকুর, পুকুরের পাশেই একটা ঝাঁকড়া আমগাছ। রাতে স্বপ্নের মধ্যেও এই ছবি দেখতে পেত ও।

তারপর সত্যি সত্যি ওইসব জায়গায় বেড়াতে গেলে প্রথমেই মিলিয়ে দেখার ব্যাপারটা নিয়ে মেতে উঠত কণিকা। আর অবাক কাণ্ড! মিলেও যেত। সামান্য একটু এদিক-ওদিক হত, তবে সেটা বড় কিছু নয়। এই যেমন পুকুরের ধারের গাছটা আমের নয়, জামরুলের। বাংলোর বাগানটা পেছনে নয়, সামনে। তবে যেমন বাগানের ছবি ও এখানে আসার আগেই দেখেছিল, এই বাগানটা হুবহু সেই রকমই।

সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়েছে কণিকার। তবে সম্বন্ধ হওয়ার কিছুদিন আগেই হবু বরের চেহারাটা ও দেখে ফেলেছিল স্বপ্নে। স্বপ্ন দেখার আগে ওই ছবিটাই ও কল্পনা করেছিল। শ্যামলা রঙ, মাথা ঠাসা কালো কোঁকড়ানো চুল, চিবুকে একটা আঁচিল আর উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। এই ছবিটার কথা কাউকে বলা যায় না, বলেওনি কণিকা। তবে চেহারাটা যখন-তখন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠত। বেশ কয়েকবার এই ছবিটাই স্বপ্নে দেখেছে ও।

স্বপ্ন দেখার কিছুদিন পরে সম্বন্ধ, তারপর বিয়ে। সৌমিত্রকে দেখেই ও চমকে উঠেছিল। অবিকল সেইরকম চেহারা তবে ওর চিবুকে কোনো আঁচিল নেই।

বিয়ে হওয়ার দিন সাতেকের মাথায় কণিকা ওর বরকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার হাইট কত?'

— 'পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি।'

— 'ইশ! এক ইঞ্চির জন্য মেলেনি।'

— 'মানে?'

কণিকা তখন ওর স্বপ্ন দেখার বৃত্তান্ত শোনাল সৌমিত্রকে। সব শোনার পর সৌমিত্র চোখ বড় বড় করে বলেছিল,—'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য' শব্দটা সৌমিত্রর খুব প্রিয়। প্রায়ই বলে থাকে। শুধু বলাই নয়, চোখেমুখে ওর আশ্চর্য হওয়ার ভাবও ফুটে ওঠে নিখুঁত ভাবে। ওই কথা ও ভঙ্গি দেখে খুব উৎসাহিত হয় কণিকা। তারপরই ও পরের স্বপ্নের কথা ভাবতে শুরু করে দেয়।

এখন কণিকা দু-রকমের স্বপ্ন দেখে। একটা স্বপ্ন জেগে জেগে, আর একটা স্বপ্ন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। দুই ধরনের স্বপ্নের মধ্যে দারুণ মিল, কেউ কোনোটাকে ছাপিয়ে যায় না। দিনের স্বপ্ন রাতে দেখার পরে মনে বেশ জোর পায় কণিকা। স্বপ্নটা যে সত্যি হবে, তা নিয়ে ওর আর কোনো সংশয় থাকে না।

তিন কামরার ফ্ল্যাট ওদের। শোবার ঘরের খাট, আলমারি, ড্রেসিংটেবল নতুন এবং হাল ফ্যাশনের। কিন্তু বসার ঘরের ফার্নিচারগুলো একেবারেই পছন্দ নয় কণিকার। পুরনো বেঢপ চেহারার আসবাবপত্র। সাজিয়েগুছিয়েও ভদ্রস্থ করা যায় না। আজকাল খবরের কাগজে শৌখিন আসবাবপত্রের ঢালাও বিজ্ঞাপন থাকে। কিছু কিছু ছবি থেকে চোখ ফেরানো যায় না। ওইসব নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল কণিকা। প্রথমে অবশ্য জেগে জেগেই।

বসার ঘরে ঠিক কী ধরনের সোফাসেট মানাবে। কী ধরনের সেন্টার টেবিল, কী ধরনের শো-কেস, কী ধরনের কাবার্ড, শ্যু-র‍্যাকটাই বা কেমন হবে— চোখের সামনে ছবি তৈরি হতে শুরু করেছিল কণিকার।

শুধু পছন্দসই আসবাবপত্র আনলেই তো হবে না, রং ফেরাতে হবে দেওয়ালের। ভালো পেন্টস চাই। চার দেওয়ালের জন্য দু-রকমের মানানসই রং। স্বপ্ন ওখানেই থামল না, দেওয়ালে ঝোলাবার জন্য ভালো ছবি চাই। সিলিং থেকে ঝুলবে এমন একটা ঝাড়বাতি থাকলেই বা কেমন হয়।

দিনের স্বপ্ন একটু পাকা হওয়ার পরে রাতে ঘুমের মধ্যেও ওই স্বপ্নটাই দেখল কণিকা। সকালে ঘুম ভাঙার পর কেমন যেন একটা বিভ্রম তৈরি হয়েছিল ওর। মনে হচ্ছিল, অমন একটা বসার ঘরেই আছে ও।

বসার ঘরটা ঢেলে সাজাবার জন্য সৌমিত্রকে বলেছিল কণিকা। গৃহকর্তার হাতে সেই সময় হঠাৎ কিছু এরিয়ারের টাকা এসে গিয়েছিল, সুতরাং গৃহকর্ত্রীর সাধ মেটাতে কোনো অসুবিধা হল না ওর। সব কিছু সাজাতে গোছাতে মাসদেড়েক সময় লেগে গিয়েছিল। আর অবাক কাণ্ড, তারপরেই স্বপ্নের ওই ছবিটার সঙ্গে ঘরের আশ্চর্য মিল দেখতে পেয়েছিল কণিকা।

সে কথা বলতেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সৌমিত্র বলে উঠেছিল,

আশ্চর্য! অন্যান্যবারের মতো এবারও আশ্চর্য হওয়ার সব চিহ্ন ওর চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল। একটু বাদে হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি যে এমন একটা স্বপ্ন দেখেছ, বলোনি তো কখনও! বললে আমার কাজের কত সুবিধা হত, বেকার মাথা খাটাতে যেতাম না'।

রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল কণিকার মুখে। — 'আজকাল আগবাড়িয়ে আর বলতে ইচ্ছে করে না। অনেকদিন ধরে তো দেখছি— আমার স্বপ্ন সব সময় সত্যি হয়ে ওঠে'।

অবিকল আগের ভঙ্গিতে সৌমিত্র আবার বলল, 'আশ্চর্য'!

বসার ঘরের আরামপ্রদ সোফায় বসে কণিকা ফের স্বপ্ন দেখা শুরু করে। কতরকম স্বপ্ন! একতলায় গেটের পাশে লাগানো বোগেনভেলিয়ার ঝাড়টা বেশ খানিকটা লম্বা হয়েছে, আর একটু লম্বা হলেই বারান্দার গ্রিলে জড়িয়ে যাবে। থোকা থোকা লাল ফুল ফুটবে। ঘরের মধ্যে ফুলদানিতে রজনীগন্ধা, স্টিরিওতে একটু নিচু পর্দায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। এবার আরও একটা স্বপ্ন দেখে, বড় আবেশে ভরা সেই স্বপ্ন।

বছরখানেক বাদে কণিকা দেখল, স্বপ্ন এক্কেবারে মিলে গেছে। ঠিক সেইরকম মুঠো করা তুলতুলে দুটো ছোট্ট হাত। একমাথা কুচকুচে কালো চুল। দুটো টানা টানা ঘুমন্ত চোখ।

লাজুক মুখে স্বপ্ন মিলে যাওয়ার কথা বলতেই সৌমিত্র অবাক হয়ে বলে উঠল, 'আশ্চর্য'! আশ্চর্য হওয়ার চিহ্ন ওর চোখেমুখেও।

আবার নতুন উদ্যমে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল কণিকা। ছেলে খুব দুরন্ত হবে। অল্প কিছুদিন হামাগুড়ি দেওয়ার পরেই টলমল করে উঠে দাঁড়াবে। হাঁটার পর্ব তাড়াতাড়ি শেষ করার পরেই ছুটতে শুরু করবে। তিন-চাকা সাইকেল চালাবে খুব ভালোভাবেই। 'ক', 'ল' আর 'চ' -এর উচ্চারণ ঠিকভাবে করতে পারবে না।

এক এক করে সব স্বপ্নই মিলে গিয়েছিল। মিলে যাওয়ার পর আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিল কণিকা। দেখল ছেলে নামকরা একট মিশনারি স্কুলে ভতি হয়েছে। স্কুলে পৌঁছে দেয় বাবা, নিয়ে আসে মা। কিন্তু বাসে যাতায়াত করা ক্রমশই কষ্টের হয়ে উঠছে। লোকসংখ্যা বেড়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বোধহয় বাসের সংখ্যা কমেছে। একটা গাড়ি থাকলে বেশ হত! এখন মাসে মাসে অল্প টাকার কিস্তি দিলেই তো গাড়ি কেনা যায়।

সাদা রঙের ছোট একটা গাড়ি হবে। তবে শুধু গাড়ি থাকলেই তো হবে না, একজন ড্রাইভারও চাই। কেমন ড্রাইভার? কালো, লম্বা, সাদা পোশাক পরা। নীচের দিকে তাকিয়ে খুব কম কথা বলে। ছুটে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দেয়, অথচ বন্ধ করে

আস্তে। মোটামুটি স্পিডে রাস্তার গর্ত বাঁচিয়ে সাবধানে গাড়ি চালায়। সাদা গাড়ি আর এমন একজন ড্রাইভার চাই।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে কণিকা, তারপর সেই সব স্বপ্ন ওর ঘুমের মধ্যে ফিরে আসে। এবারও দেখল, একই স্বপ্ন বেশ কয়েকদিন ধরে। তারপর আবারও সেই ঘটনা। ও যা-যা ভেবেছিল, ঠিক তাই ঘটে গিয়েছে। গাড়িটা ছোট, সাদা রঙের। ড্রাইভারও রাখা হল, অবাক কাণ্ড, ড্রাইভারের চেহারাও ঠিক সেইরকম।

সব শুনে আরও একবার ঠিক আগের মতোই অবাক হয়ে গিয়েছিল সৌমিত্র। অবাক হওয়ার চিহ্নগুলো ওর মুখে ছড়িয়েও ছিল অনেকক্ষণ।

এতদিন ধরে একটার পর একটা সব স্বপ্ন মিলে যাওয়ার জন্য কণিকা বোধহয় ওর বিশ্বাসবোধের শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছিল। এখন চলতে ফিরতে ও সব সময় স্বপ্ন দেখে। ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি অনেকক্ষণ আটকে গেলেও ওর স্বপ্নের সুতো ছেঁড়ে না। নতুন নতুন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল কণিকা।

এইভাবে চলার পথে একদিন বিচ্ছিরি একটা রদবদল হয়ে গেল। সেদিন শুকনো মুখে সৌমিত্র অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল কণিকা। উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে তোমার?'

উত্তর এড়িয়ে যেতে চাইছিল সৌমিত্র, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। মুখ কালো করে যা বলল, তা তো ভয়ঙ্কর। শুনতে শুনতে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল কণিকার।

টুকরো টুকরো অনেক কথায় সৌমিত্র বলল— নতুন প্রজেক্টে ওদের কোম্পানি বিরাট একটা লোকসানের মধ্যে পড়েছে। এই ব্যাপারে ওর বস ওকেই দায়ী করেছে। বেসরকারি সংস্থা, এখানে মাইনেপত্তর, সুযোগসুবিধা অনেক, কিন্তু যা নেই তা হল চাকরির স্থায়িত্ব। মালিকের পছন্দ-অপছন্দের ওপর ম্যানেজমেন্টের লোকদের ভাগ্য নির্ভর করছে। কাউকে চলে যেতে বললেই চলে যেতে হবে তাকে।

সবকিছু শোনার পরে কণিকা আবার স্বপ্ন দেখার চেষ্টা জুড়ে দিয়েছিল— মনোমতো স্বপ্ন। সৌমিত্র নির্দোষ, এটা বোঝার মতো কোনো একটা ঘটনা এক্ষুণি ঘটে যাক ওদের অফিসে। তবে ঘটনা ওখানেই থামবে না। সৌমিত্রর পরিকল্পনায় নতুন প্রজেক্টে হাত দেবে কোম্পানি, আর সেই প্রজেক্ট থেকে বিরাট একটা লাভ উঠে আসবে।

কণিকা যা ভাবে তাই নিয়েই স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এবার আর তা হল না। এক রাত্রির দু-রাত্রির, তিন রাত্রির কেটে গেল, কিন্তু মনের মতো স্বপ্নের একটা টুকরোও ঘুমের মধ্যে দেখতে পেল না। এমন তো হয়নি কখনো! দুশ্চিন্তায় ওর ঘুম কমে গিয়েছিল। মাঝেমধ্যে ঘুমোতেই পারত না সারা রাত।

ওদিকে মুশকিল আসানের বদলে সৌমিত্রর অফিসের গোলমাল বেড়ে গিয়েছিল আরও। অফিস কর্তৃপক্ষ ওর হাত থেকে কয়েকটা দায়িত্ব কেড়ে নিল। তার ধাক্কা লাগল মাস-মাইনেয়। স্যালারি চেকের অঙ্ক বেশ খানিকটা কমে গিয়েছিল। এর চাপ পড়ল বাড়িতে। সংসারের নানা ব্যাপারে কাটছাঁট শুরু হয়ে গিয়েছিল তার ফলে।

কিছুদিন বাদে অবস্থার আরও খানিকটা অবনতি হল। অফিসের কাজে সৌমিত্রর মস্ত বড় একটা ভুল ধরা পড়ল। এমন ভুল ওর কখনো হয়নি। আসলে ও আর চাপ সহ্য করতে পারছিল না। টের পাচ্ছিল, চারদিক থেকে বেয়াড়া একটা ষড়যন্ত্র চেপে ধরছে ওকে। ভুলের খেসারত দিতে হল। বাড়িতে ওর কথাবার্তা কমে গিয়েছিল। এমনিতে ও কখনো মাথা গরম করত না, এখন কথায় কথায় চটে যায়। আগে অফিসের কথা বাড়িতে বলত না, এখন মাঝে মাঝে বলে ফেলে। সেদিন হঠাৎই বলল, 'মালিক ওর পেয়ারের লোককে বসাতে চায় আমার জায়গায়। সেই জন্যই আমার বিরুদ্ধে একটার পর একটা অভিযোগ খাড়া করছে। কাউকে তাড়াতে গেলে তো বদনাম দিতে হয় আগে, সেই কাজটাই চলছে এখন।'

এসব কথার কী জবাব দেবে কণিকা! ও প্রাণপণে নানারকম দৈব ঘটনার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাগ্য সহায় হলে কী না হয়! ডুবন্ত নৌকো ভাসতে ভাসতে তীরে এসে ঠেকে। মৃত্যুর মুখ থেকে কত বিমানযাত্রী একটুর জন্য বেঁচে ফেরে, গায়ে আঁচড়টা পর্যন্ত লাগে না। এমন তো কতই হয়ে থাকে!

প্রাণপণে নানারকম দৈবসহায়ের কথা ভাববার চেষ্টা করতে লাগল কণিকা। কিন্তু কিছুই ও গুছিয়ে ভেবে উঠতে পারল না। স্বপ্ন দেখা তো অনেক দূরের ব্যাপার, তবে ও হাল ছাড়েনি।

সৌমিত্রর অফিসে কিন্তু উল্টো ব্যাপারটাই ঘটে গিয়েছিল। একদিন ও অফিস থেকে ফিরে এসে মুখ কালো করে বলল, 'চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।'

'সে কি!'

'অপমান আর সহ্য করা যাচ্ছিল না।'

অনেকক্ষণ বাদে শুকনো গলায় কণিকা বলেছিল, 'ঠিক করেছ।'

পরদিন থেকে সংসারে আরও কাটছাঁট। লম্বা চেহারার বিনীত ড্রাইভারকে ছেড়ে দিতে হল। শেষে ধপ্‌ধপে সাদা গাড়িটাও চলে গেল অন্যের গ্যারাজে।

জমানো টাকা ফুরোতে শুরু করেছিল একটু একটু করে, ঘরে আড়াইজন প্রাণী, কিন্তু ছেলে স্কুলে চলে গেলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বলার মতো কথা ধরতে গেলে থাকতই না। অত সুন্দর করে সাজানো ফ্ল্যাট এখন অগোছালো। বাহারি সোফার খাঁজে হালকা ধুলোর চাদর।

চাকরি ছাড়ার পরদিন থেকে নতুন চাকরি খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিল সৌমিত্র, কিন্তু মন্দার বাজার, চাকরি নেই কোথাও। বিভিন্ন এজেন্সির কাছে সিভি জমা আছে ওর, নিজেও সরাসরি কয়েকটা সংস্থার কাছে চাকরির আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। দিন গড়াতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। জমানো টাকা এখন তলানিতে। এবার বোধহয় ঘরের জিনিসপত্রে হাত পড়বে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তার পরিমাণ আরও কমে গিয়েছে। এমন সময় হঠাৎই একটা ইন্টারভিউয়ের চিঠি এল। অনেকদিন আগে পাঠানো আবেদনপত্রের জবাব।

নির্দিষ্ট দিনে ইন্টারভিউ দিয়ে এলো সৌমিত্র।

কণিকা অপেক্ষায় ছিল, ফিরতেই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন হলো?'

হাসার চেষ্টা করল সৌমিত্র— 'এর আর হওয়াহয়ির কি? ওদের যা রিকোয়ারমেন্ট, আমার তো সবই আছে। এখন ওরা যদি আমার চাইতে আরও ভালো কাউকে পেয়ে যায়। কোনো ক্যান্ডিডেটের আবার ভালো কোনো রেফারেন্সও থাকতে পারে, তেমন হলে তো আর যোগ্যতার প্রশ্ন উঠছে না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর কণিকা বলল, 'দেখো, চাকরিটা তোমার হয়ে যাবে।'

ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল সৌমিত্রর মুখে— 'কী করে বুঝলে?'

‘আমার মন বলছে।’

পরদিন সকালে ঝলমল করছে কণিকার চোখমুখ। একটু লাজুক-লাজুক গলায় বলল, ‘অনেকদিন বাদে কাল রাতে আবার আমি স্বপ্ন দেখেছি।’

‘কী স্বপ্ন?’

‘চাকরিটা তোমার হয়ে গেছে।’

‘তাই!’

‘অফিসে তোমার বসার জায়গাটা কেমন হবে তাও দেখেছি।’

হাসার চেষ্টা করল সৌমিত্র।

‘ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে কেমন দেখতে তাও দেখেছি। বয়েস ষাটের ওপর, বেশ হাসিখুশি মানুষ। মাথায় ধপ্‌ধপে সাদা চুল।’

আরও একবার হাসার চেষ্টা করেছিল সৌমিত্র।

দু’দিন পরে ওই অফিস থেকে ফোন এল সৌমিত্রর কাছে। ডাইরেক্টর চান, কাল থেকেই ও জয়েন করুক।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে ঝক্‌ঝকে সৌমিত্র কণিকাকে বলল, ‘অবাক কাণ্ড! তুমি যা বলেছিলে আমার বসার জায়গাটা ঠিক সেইরকমই। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চেহারাটাও মিলিয়ে দিয়েছ। একমাথা সাদা চুল। সব মিলিয়ে এই চাকরিটা আগের চাইতে অনেক ভালো বলেই তো মনে হচ্ছে।’

খুব খুশি হয়েছিল কণিকা। খুশি হওয়ারই কথা। ওর চোখমুখের ঝলমলে ভাবটা একবারের জন্যও মিলিয়ে যায়নি।

পরদিন সকালে সৌমিত্র অফিসে চলে যাওয়ার পর নতুন করে আবার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল কণিকা। একটা শিরশিরানি ভয় ছড়িয়ে পড়েছিল ওর সারা শরীরে। না, না, ও আর যখনতখন এভাবে স্বপ্ন দেখবে না। দিনেও না, রাতেও না। ■

With Best Compliments from -

A

Well

Wisher

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন

অমলেশ মিশ্র

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মাত্র ৫২ বছর বেঁচেছিলেন। ১৯১৫ সালে জন্ম হয় এবং ১৯৬৮ সালে এক অজ্ঞাত আততায়ী তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি, গণিত সব বিষয়েই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এই মেধাবী ছাত্রটি সর্বদাই স্বর্ণপদকের অধিকারী হয়েছিলেন— দারিদ্র্যের মধ্যেই জন্ম— দারিদ্র্যেই জীবন কেটেছে। কখনও ধনী হওয়ার বাসনা ছিল না। সুযোগ ছিল,

নেননি— প্রয়োজনই বোধ করেননি। অথচ তখনকার রাজনৈতিক জগতে এমন কেউ ছিলেন না যিনি এই ভিন্ন রাজনীতির মানুষটির গুণগ্রাহী ছিলেন না। তাঁর অকাল মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করা বা মৃতদেহে মাল্যার্পণ করায় প্রত্যেকেরই অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। সে তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ হওয়ায় এখানে উল্লেখ করা গেল না।

দীনদয়াল নিজে অত্যন্ত প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাছাড়া তাঁর জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক দল প্রচারমাধ্যমগুলির কাছেও আকর্ষণীয় ছিল না। তাঁর রাজনীতি তথা জীবনদর্শন ছিল একান্ত সাধাসিধা। সহজ, সরল নির্ভেজাল ভারতীয় চিন্তাধারা। না আছে গোষ্ঠী রাজনীতি, না আছে পাশ্চাত্য প্রভাব। পোশাক-আশাকে অত্যন্ত সাধারণ, মুখে চোখে জ্ঞানের অহঙ্কার নাই, কর্মীদের সঙ্গে একই সারিতে দাঁড়িয়ে খাবার নেন, নিজের বাসন নিজেই ধুয়ে নেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো ঋষিসুলভ জীবনযাত্রা। চটকপিয়াসী সংবাদমাধ্যম স্বাভাবিকভাবেই খুব উৎসাহী ছিল না। তবে তখনকার ভারতে সম্ভবত দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের সাধারণ সম্পাদক দীনদয়ালকে অগ্রাহ্যও করা যেত না।

পড়াশোনা শেষ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন ২১ বছর বয়সে কানপুরে মকর সংক্রান্তির দিন। মাধ্যম ছিলেন ভাউরাও দেওরস (উত্তরপ্রদেশে তৎকালীন সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক)।

ড. শ্যামাপ্রসাদ যখন কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে কংগ্রেস বিরোধী ভারতীয় চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ভাবছিলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নির্দেশে দীনদয়াল ভারত কেশরীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ভারতীয় জনসঙ্ঘ তৈরি হয় ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর। তখন থেকেই দীনদয়াল দলের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৭ সালে দলের সভাপতি। বিজয়ওয়াড়ায় ১৯৬৫ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘ একাত্ম মানবদর্শনকেই দলীয় দর্শন হিসাবে গ্রহণ করে সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভায়।

তবে একাত্ম মানবদর্শন যে কোনো মানুষ, সে যে সম্প্রদায়েরই হোন, যে কোনো রাজনৈতিক দলই জীবনের ও দলের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এই দর্শন গ্রহণ করে একজন মানুষ যেমন উপকৃত হতে পারে, একটি রাজনৈতিক দলও।

কিন্তু অসুবিধা হলো, ভারতবর্ষের সংবিধান মানুষজন এবং প্রায় সব রাজনৈতিক দলই পাশ্চাত্য দর্শন ও পাশ্চাত্য চিন্তা প্রণালীতে অভ্যস্ত। ১৮৫৪ সালে ইংরাজরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পাঠক্রম তৈরি করেছিল, তা আজও অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। সেই ব্যবস্থা ও পাঠক্রমে ভারতীয়তার কোনো স্থান নেই। যদিও এই ভারতীয়তার বয়স কম করেও ছয় হাজার বছর। একইভাবে রাজনৈতিক দর্শন বলতেও আমরা সেই পাশ্চাত্য দর্শন বুঝি, যার বয়স অনেক বাড়িয়ে বললেও ৮০০ বছরের বেশি নয় এবং সেগুলির কোনোটিই ক্রিয়া হিসাবে নয়, প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্ম নিয়েছে। যেমন পোপতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় সার্বভৌম রাজতন্ত্র, সার্বভৌম রাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় গণতন্ত্র, পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়ায় সাম্যবাদ, সাম্যবাদের প্রতিক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, তার প্রতিক্রিয়ায় কল্যাণকামী রাষ্ট্র ইত্যাদি। এখন চলছে যন্ত্র দৈত্যের যুগ। এর প্রতিক্রিয়ায় কী জন্ম নেবে বলা যাচ্ছে না।

একটা বিরাট বটগাছ (শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন) যখন থাকে যে তার কোন কাণ্ডটা আসল বোঝাই যায় না। ঝুরি নেমে নেমে কতশত বছর ধরে তার কত কাণ্ড তৈরি হয়ে গেছে, কত বিচিত্র শাখাপ্রশাখা। কত পাতা, কত ফল! কত পাখি সেই ফল খাচ্ছে, কত রৌদ্রশ্রান্ত পথিক তার তলায় বিশ্রাম নিচ্ছে। কত বিচিত্রই না লাগে। কিন্তু ভেবে দেখুন, ঐ বিশাল বৃক্ষ একটি মাত্র ছোট্ট বীজ থেকেই উদ্ভব হয়েছে। দীনদয়ালজী বলেছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও একটি বীজ থেকে, যত বৈচিত্র্যই আমরা দেখি না কেন, সব বৈচিত্রের মূলে রয়েছে একটি মাত্র বীজ। বৈচিত্র্যগুলি সবই ভাসা ভাসা, উপর উপর। বৈচিত্র্য থেকে এক হয়নি, এক থেকেই বৈচিত্র্য এসেছে। এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক বৈচিত্র ৫০ বছর, ৫০০ বছর নয় হাজার বছর চূড়ান্ত শৃঙ্খলার মধ্যেই প্রবহমান ও দৃশ্যমান আছে। অশান্তি, দুর্যোগ যদি কিছু ঘটে থাকে, তা সাময়িক। রক্তক্ষয় কখনও নীতি হতে পারে না, একটি পর্যায় মাত্র যেমন শিশুর জন্মের কালে মায়ের রক্তক্ষরণ। যাঁরা বলেন, পৃথিবীতে একমাত্র যোগ্যতমেরই বাঁচার অধিকার আছে, তাঁরা ভুল বলেন। ব্রহ্মাণ্ডের এই বৈচিত্রের মধ্যে সকলেরই বাঁচার অধিকার আছে। আর বাঁচার জন্য যুদ্ধ— এ তত্ত্বও ঠিক নয়। বাঁচার জন্য শ্রম লাগে, ভালবাসা লাগে, সহানুভূতি লাগে, সকলকে নিজের মতো ভাবার মতো মানসিকতা লাগে। এই মানসিকতা তখনই আসে, যখন আমরা বসুধৈব কুটম্বকম্ তত্ত্বে আস্থা রেখে সকলকে নিজের মতো দেখতে অভ্যস্ত হই।

যেহেতু ভারতীয় দর্শনে মানুষ মাত্রকেই অমৃতের পুত্র বলা হয়েছে, সেহেতু মানুষে মানুষে জাত-পাত, সম্প্রদায় বিভেদ থাকা স্বাভাবিক নয় এবং Greatest good for the greatest number তত্ত্বও ঠিক নয়। আমাদের ভারতীয় তত্ত্ব হল— সকলেই এখানে সুখে থাকুক, সকলেই সুস্থ থাকুক, কেউ যেন দুঃখ না পায়। সকলের জন্য ভাল চাই। সকলের জন্য সুখ চাই। প্রশ্ন আসছে— তা কীভাবে সম্ভব? সম্ভব তখনই যখন আমরা আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে পারব।

একান্ত মানবদর্শন বলছে— মানব সমাজ এবং তার

চতুপার্শ্বস্থ সম্পূর্ণ জীব ও জীব জগৎ অগণিত বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও এদের সকলের একটি সম্মিলিত আত্মা আছে— যাকে আমরা Ethos বা Soul বলতে পারি। এই সম্মিলিত আত্মা বা Supreme Soul -এর কারণেই সমস্ত কিছু পরস্পর সহযোগী ও পরিপূরক। এই ধারণাকেই একাত্মতা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য দর্শন আমাদের সব কিছুই খণ্ড খণ্ড করে দেখিয়েছে এবং খণ্ডিতগুলি ঐক্যবদ্ধ করে ঐক্য তৈরির বাহবা নিয়েছে। কেউ বলছেন Man is a political animal, কেউ বলছেন, economical animal, আবার কেউ বলছেন, intellectual animal, আবার কেউ বলছেন, Philosophycal animal, কিন্তু একজন মানুষ এর কোনো একটি নয় এগুলির সবগুলিই। —Political, Economical, Intellectual এবং Philosophical।

সমাজ কোনো চুক্তির ভিত্তিতে তৈরি হয়নি। ব্যক্তি বড় কী সমাজ বড়, এ বিতর্কটাও অবান্তর। সমাজ জন্ম নেয়, তৈরি হয় না। কারখানায় গাড়ি তৈরি হতে পারে, কিন্তু ঘোড়া তৈরি হয় না। শরীরের এতগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, তাই নিয়েই দেহ। এই অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলির কোনোটি অসুস্থ হলে চিকিৎসা করা যেতে পারে, কিন্তু কোনো অঙ্গকেই বাদ দেওয়া যায় না, আর কোনটি বড় কোনটি ছোট তাও নির্ণয় করা বোকামি। পূর্ণদেহ মানেই এগুলির সবগুলি।

মানুষ মাত্রেই সুখ চায়। এতে অপরাধ নেই, দোষ নেই। কিন্তু কীসের সুখ? মানুষের চারটি ভাগ আছে— দেহ, মন, বুদ্ধি, আত্মা। সুখ এগুলির সবগুলিরই চাই। মানুষের যেমন তেমনি পরিবার, সমাজ, দেশ, বিশ্ব সকলেরই দেহ, মন, বুদ্ধি, আত্মা আছে। অনেকেই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, আত্মার অস্তিত্ব গ্রাহ্য নয়। তাঁরা মনের ও বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা ভাবেন না যে একটি রোবটের দেহ, মন, বুদ্ধি আছে, কিন্তু আত্মা নেই বলে সেটি রোবটই থেকে যায়, মানুষ হয় না।

দেহ, মন, বুদ্ধি এবং আত্মার সুখ সকলেই অর্জন করতে পারেন। চারটি পুরুষার্থ সাধনের দ্বারা। এই চারটি পুরুষার্থ হলো ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। এই চার পুরুষার্থ শুধু ব্যক্তি নয়, পরিবার, সমাজ, দেশ, বিশ্ব সবারই এই করে পুরুষার্থ অর্জন প্রয়োজন দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সুখের জন্য।

ভারতীয় ধারণা

পাশ্চাত্য ধারণা

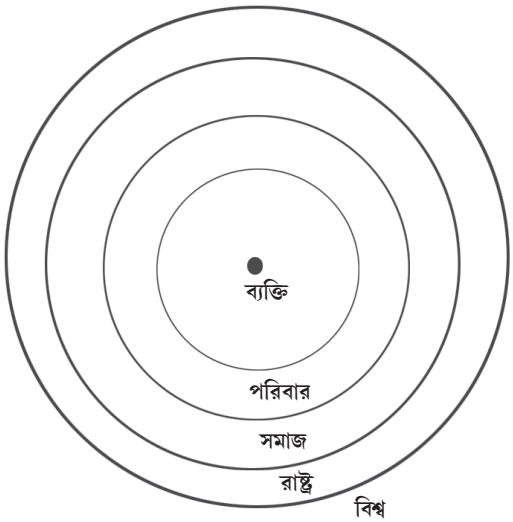

আমাদের সুখের ধারণা বড় একপেশে। আমরা বেশি করে দৈহিক সুখ তার মধ্যে আবার বিশেষ করে ইন্দ্রিয় সুখের কথা ভাবি। কিন্তু সুখ কেবল ইন্দ্রিয় বা দৈহিক হলেই মানুষের চলবে না। তার মন বুদ্ধি এবং আত্মারও সুখ চাই।

মানুষের কাম ও কামনা অগাধ। কত কিছু কামনা করে মানুষ। কিন্তু তার যাবতীয় কামনা পূরণ হওয়া নির্ভর করে তার অর্থ পুরুষার্থের উপর।

অর্থের প্রভাব এবং অভাব দুটোই খারাপ। প্রত্যেক মানুষের উপযুক্ত কাজ পাওয়া চাই এবং তার জন্য উপযুক্ত বেতন। অর্থের অভাবে মানুষ নষ্ট হয়, অর্থের প্রভাবেও নষ্ট হয়।

ব্যক্তি যদি কেবল নিজের সুখ নিয়ে ভাবে তাহলে চলবে না। যদি সে ধর্মপথে তার কাম এবং অর্থ পুরুষার্থ পূরণ করে তাহলেই সব দিক ঠিক থাকে। ধর্মপথে মানে মূল্যবোধের পক্ষে। আমার উন্নতির জন্য অন্যেকর ক্ষতি না করাই মূল্যবোধ বা ধর্ম।

আবার উন্নতির অর্থই হল সমাজের উন্নতি, দেশের উন্নতি। তাই আমার অর্থ পুরুষার্থ চরিতার্থ করার সময় মাথায় রাখতে হবে যে আমার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও উন্নতি হল কিনা।

ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে। আরও একটা বড় ভুল যে ধর্ম এবং রিলিজিয়ন আমরা সমার্থক মনে করি। রিলিজিয়ন-এ পুজো, উপাসনা ইত্যাদি থাকবেই, ওগুলি না থাকলে রিলিজিয়ন হয় না। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে পূজা, উপাসনা ইত্যাদি থাকলে থাকতে পারে, তবে না থাকলেও ক্ষতি নাই। ধর্ম হল কতকগুলি মূল্যবোধের সমষ্টি যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ দেশ, বিশ্ব এবং ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই উন্নয়ন ঘটায়। আমরা পৃথিবীতে যে সব রিলিজিয়ন-এর কথা জেনেছি সেগুলির প্রত্যেকটিই প্রবর্তিত। সেই রিলিজিয়ন-এ

(ক) একজন ঈশ্বর থাকবেনই, (খ) একটি ধর্ম পুস্তক থাকবেই, (গ) একজন অবতার থাকবেনই। তাই রিলিজিয়ন হল একটি পথ বা পন্থ যা মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরকে যুক্ত করার উপাসনা পদ্ধতি। এক একটি সম্প্রদায় এক এক এক ধরনের উপাসনা পদ্ধতি অনুসরণ করে। কিন্তু উপাসনা পদ্ধতি ধর্ম নয়, রিলিজিয়ন। ধর্ম কোনো প্রবর্তিত বিষয় নয়। ধর্ম আবর্তিত। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার বিবর্তন হয়। রিলিজিয়ন যেহেতু প্রবর্তিত, তাই তার বিবর্তন হয় না। কালপ্রবাহের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। হাজার দু-হাজার বছর আগে যা ছিল আজও তাই।

যখন অর্থ ও কাম পুরুষার্থ ধর্মানুমোদিত ভাবে অর্জন বা পূরণ করা যাবে তখন তা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজেরও উপকার ও উন্নতি ঘটাবে।

যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে একটি বিরাট হৃদয়হীন যন্ত্রের একটি অংশ মনে করা হয়, অপরদিকে যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে আত্মকেন্দ্রিক একটি জীব, যে সমাজের কথা ভাবে না বলে ধরে নেওয়া হয়— দুটো ব্যবস্থাই ত্রুটিপূর্ণ। আবার যে ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার চারটি অস্তিত্বের দেহ-মন-বুদ্ধি-আত্মার মধ্যে যে কোনো একটি বা দুটিকে মাত্র ব্যক্তির প্রয়োজন মনে করে, সে ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ।

একজন আদর্শ মানুষ একাত্ম মানবদর্শন অনুসারে চারটি পুরুষার্থকেই বিবেচনায় আনে এবং তদনুরূপ কাজ করে— সে নিজের, পরিবারের, জাতির, বিশ্বের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের কথাও ভাবে।

মানুষ একা নয়, সে অনেক ব্যক্তি ও অনেক বস্তুর সঙ্গে বাস করে। এগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং এরা পরস্পরের পরিপূরক ও সহযোগী। যে শক্তি বা নীতি সমগ্র মানব সমাজকে যুক্ত রেখেছে, সেই শক্তি বা নীতিই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একাত্ম রেখেছে।

দেহ, মন, বুদ্ধির সুখ বুঝে উঠতে কষ্ট হয় না, কিন্তু আত্মার সুখ বলতে কী বোঝায় এবং তার সুখই বা কীভাবে পাওয়া যায়?

সাধারণ মানুষের আত্মা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। ভারতবর্ষে আত্মাকে অশরীরী, নির্গুণ ও নির্লেপ বলা হয়েছে। রসায়ণশাস্ত্রে কিছু গ্যাসের উল্লেখ আছে, যার কোনো রঙ, গন্ধ, স্বাদ নেই। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে আত্মাকে দেখা যায়, শোনা যায়, অনুভব করা যায়। কেউ কেউ বলেন, আত্মা বিশ্ব সৃষ্টির মূলে। 'তিনি' সর্বত্র বিরাজমান, সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর, পরমব্রহ্ম। 'তিনি' অখিল বিশ্বকে চালনা করছেন। তবে অনেকেই এই শক্তিতে বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে, কেবল দৃশ্যমান জগতেই সত্য। উপভোগের জন্য পার্থিব বস্তুর প্রাচুর্যই আসল কথা।

আমরা চিন্তা করলে বুঝব যে আমাদের মধ্যে অনুভূতি যিনি জাগাচ্ছেন তিনি এই দৃশ্যমান জগতের বাইরে, ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি। তার যে নামই দেওয়া হোক, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রত্যেকেই তার সঙ্গে একরূপ হওয়ার পথেই চলেছে। আত্মার সুখ নির্ভর করে আত্মার উপরেই। যখন মানুষ সমস্ত কিছুই 'আমি' বা 'ব্রহ্ম' এই ভাবনার দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার মধ্যে 'আমি' আর 'তুমি' এই পার্থক্য ঘুঁচে যায়। কোনো ভয় থাকে না, কোনো স্বার্থবোধ থাকে না। যা থাকে তাহ হল অবিমিশ্র আনন্দ।

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই আছে। মানুষেরও আছে। কিন্তু যখন কোনো মানুষ নিজেকে এই চারটিতে সীমাবদ্ধ রাখে, তখন সে জানোয়ার। জীবনের কোন আদর্শের পথে অগ্রসর হলে মানুষ সুখ ও তুষ্টি লাভ করে।

মৃগনাভি কস্তুরী হরিণ যেমন নিজের নাভিদেশে কস্তুরী থাকা সত্ত্বেও তার অন্বেষণে বাইরে সর্বত্র ছুটে বেড়ায়, মানুষও তেমনি নিজের অন্তরে চিরন্তন সুখের ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও সুখের জন্য সর্বত্র দৌড়ে বেড়ায়। এবং তাও কেবল অর্থ ও কামনার পিছনে। তাহলে আর পশুর জীবনযাত্রার থেকে মানুষের জীবনযাত্রার পার্থক্য কী থাকল? একাত্ম মানবদর্শনে সেই জন্য আত্মার সুখের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং মূল্যবোধের জীবনযাত্রা, আদর্শ জীবনযাত্রা বলে উল্লেখিত হয়েছে। সমস্তরকম সুখভোগই মানুষ করতে পারে তবে সংযম ও ত্যাগের মাধ্যমে।

একাত্ম মানবদর্শনে আত্মার সুখের সঙ্গে 'মোক্ষ' শব্দটির গভীর সম্পর্ক আছে। 'মোক্ষ' শব্দটি 'মুচ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। মুচ অর্থে মুক্ত করা। মোক্ষ লাভ একটি উচ্চ আদর্শ যা মানুষ মাত্রেরই থাকা প্রয়োজন। এর সাধনা জীবনভর করতে হয়। মানুষকে ধর্মপথে অর্থ ও কাম-এর সাধনা করতে হবে এবং

শেষপর্যন্ত তার থেকে মুক্তি অর্থাৎ সেগুলি সম্পর্কে অনাসক্ত আনতে হবে, নিরাসক্ত হতে হবে।

মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান— তিনটি মার্গ উল্লেখিত হয়েছে। এদের মধ্যে কর্মের সম্পর্ক দেহের সঙ্গে, ভক্তির সম্বন্ধ মনের সঙ্গে এবং জ্ঞান-এর সম্পর্ক বুদ্ধির সঙ্গে। এর মানে এই নয় যে মোক্ষ পুরুষার্থর পথ এই তিনটির থেকে পৃথক এবং সমান্তরাল অন্য কিছু। সম্পর্কটা এই রকম যে, ভক্তিসমন্বিত, জ্ঞানযুক্ত, নিষ্কাম কর্ম মোক্ষ লাভের পথ। নিষ্কাম কর্ম বলতে বলা হয়েছে যে, কর্মের ফল সম্পর্কে নিরাসক্ত থাকা। কর্মহীন ভক্তি কেবল ভাবুক তৈরি করে, ভক্তিহীন কর্ম নীরস, জ্ঞানহীন কর্ম অন্ধ এবং কর্মহীন জ্ঞান পঙ্গু। তাই চার পুরুষার্থই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

পণ্ডিত দীনদয়ালজী বলেছেন--- এইরূপ চতুর্বিধ পুরুষার্থের সঙ্গে যুক্ত পূর্ণ মানবই আমার আরাধনার নির্যাস। ব্যক্তির যেমন এই চারটি পুরুষার্থ আছে এবং চারটি সুখের লক্ষ্য আছে — একই ভাবে পরিবার, সমাজ বা সমষ্টির, দেশের এমন কী বিশ্বেরও চারটি পুরুষার্থ ও চারটি সুখের প্রয়োজন। ঠিকমত মানুষ তৈরি হলেই তা সম্ভব।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে উদ্ভব এই একাত্ম মানবদর্শন কেবল মানুষ, সমাজ, দেশ ইত্যাদির কথা বলেই থেমে যায়নি। মানবেতর প্রাণীসমূহ, উদ্ভিদ জগৎ এবং জড় জগৎ সম্পর্কেও এই দর্শন বিস্তৃত। জল, বায়ু, সূর্যকিরণ, বনস্পতি, প্রাণী, খনিজ সম্পদ আদি আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে আছে যে এগুলি ব্যতীত প্রাণ ধারণই সম্ভব নয়, সুখ ভোগ তো পরের কথা। প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যেহেতু আমাদের সুখের উৎস এবং যেহেতু এগুলি বংশ পরম্পরায় ভোগ করতে হবে, সেহেতু এগুলির ব্যবহার বিচক্ষণতার সঙ্গে করতে হবে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা আমাদের শিখিয়েছে, প্রকৃতিকে শোষণ করতে। ভারতীয় সংস্কৃতি বলছে, প্রকৃতিকে দোহন করতে।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার তিনটি স্লোগান— 'যোগ্যতমেরই বাঁচার অধিকার', 'বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম' এবং 'প্রকৃতিকে সুখ ভোগের জন্য শোষণ'; মানবসমাজকে আজ এমন এক দুর্বিপাকে ফেলেছে যে তার থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

দীনদয়ালজী বলেছেন--- আমাদের উদ্দেশ্যপূর্ণ সুখভোগের জন্য অবশ্যই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যয় করব। যদি আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির গভীরে প্রবেশ করি তবে জানব যে, আমাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাসমূহ প্রকৃতিকে শোষণ করবে না, প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে— এমন ধরনের হওয়া চাই।

আগেই বলা হয়েছে, পাশ্চাত্য সমাজদর্শনগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো— সেগুলির সবগুলিরই জন্ম হয়েছে প্রতিক্রিয়া হিসাবে। তাই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল সংঘর্ষ ও রক্তপাত। সংঘাত হয়ত প্রয়োজন ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে। কিন্তু সেই সংঘাত ও সংঘর্ষকে দূর করার চেষ্টা না করে তাকে একটি নীতি বলে গুরুত্ব দেওয়া হল। নীতিটা দাঁড়াল এই যে, মানুষের বিবর্তনে এই সংঘর্ষ সংঘাত অনিবার্য। ডারউইনের জীববিদ্যার ব্যাখ্যা, হেগেলের দর্শন, মার্কসের ইতিহাস ব্যাখ্যা— সবই এই নীতির ভিত্তিতে রচিত। প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ, রক্তপাত প্রভৃতিকে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য এবং তা অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

দীনদয়ালজী বলেছেন, মানুষ যদি স্বভাবগতভাবে এই রকম হয় যে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ না করলে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না অর্থাৎ অপরের ক্ষতি করে নিজের লাভ, তাহলে তাকে ভালবাসার শিক্ষা দেওয়া, সহযোগিতার শিক্ষা দেওয়া, অপরের জন্য ত্যাগ করার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এই যদি মানুষের প্রকৃতি হয় তাহলে ঘৃণা, অসহযোগিতা, অসহনশীলতা, দ্বেষ এবং ঈর্ষাই সত্য বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু এইগুলিকে তো আমরা সমাজ জীবনের অনুকূল বলে মনেই করি না।

পাশ্চাত্য তত্ত্বগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো— এগুলি মানুষকে তার পূর্ণ রূপে না দেখে খণ্ড খণ্ড করে দেখে। কেউ বলে রাজনৈতিক জীব, কেউ বলে অর্থনৈতিক জীব। ফরাসি বিপ্লব তিনটি নির্ভেজাল ভাল আদর্শের কথা বলেছিল--- সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী। কিন্তু মানুষকে এই টুকরো টুকরো করে দেখার, তৎকালীন সমাজ চিন্তকরা ঐ আদর্শগুলি রূপায়ণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জীবনের একটি উপাদান অন্য উপাদানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। একটি উপাদনকে বেছে নিয়ে, তার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করা সমগ্র মানব সমাজের ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত সত্য হয় না। এই বিচ্ছিন্ন করে দেখার কারণেই বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

কেবল ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে নয়, সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা এই ধরনের বিচ্ছিন্ন চিন্তা করেছেন। তারা ব্যক্তি, পরিবার, জাতি এবং মানব সমাজকে পৃথক পৃথক সত্তা হিসাবে দেখেছেন। যে বন্ধন সবগুলিকে এক করে রেখেছে, সেই বন্ধন দেখতে পাননি।

তারা এ বিষয়টি বিবেচনায় আনেননি যে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি তথা সমগ্র মানব সমাজ এক অন্তর্নিহিত বন্ধনে আবদ্ধ। একটি যোগসূত্র আছে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে এইরকম একটি রেখা চিত্র দিয়ে প্রকাশ করা যায়—

কেন্দ্রে আছে ব্যক্তি, ধীরে ধীরে বড় এবং আরও বড় বৃত্ত— পরিবার, সমাজ, দেশ ইত্যাদি। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই পরিবার,

সমাজ, দেশ ইত্যাদিকে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক বৃত্ত যদিও সমকেন্দ্রিক, সেগুলি স্বাধীন, কেউ কারুর সঙ্গে যুক্ত নয়। ভ্রান্তি এখানেই যে, বৃত্তগুলি যে এক অন্তর্নিহিত সূত্রে আবদ্ধ সেদিকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা নজর দেননি। এই চেতনার অভাবে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ, ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিবার, এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর এক রাষ্ট্র, প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ, মানবতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবাদ সংঘর্ষ করে চলেছে।

পাশ্চাত্য চিন্তায় এই পৃথক সত্তা ও অস্তিত্বের ধারণা, সম্ভবত সামাজিক চুক্তি মতবাদ থেকে এসেছে যা সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এই বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার কারণে মানুষের একতার জন্য যে বড় বড় প্রয়াস হয়েছিল সেগুলি ব্যর্থ হয়েছে। আমরা খৃষ্টান ও ইসলামের কথা বলতে পারি। এদের বিস্তার দূর দূরান্তে হয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রয়াস ছিল বৈচিত্র অস্বীকার করে সব মানুষকে একজন ঈশ্বর, একটি ধর্মগ্রন্থ ও একজন প্রেরিত পুরুষের আওতায় আনা। মার্কসবাদের ক্ষেত্রেও এই ভ্রান্তি দেখা গেছে।

প্রকৃতপক্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ের অতিরিক্ত এমন বিষয় আছে, যা মানুষের উপর প্রভাব ফেলে। তার পরিবার আছে, ধর্ম আছে, শ্রদ্ধাস্থল আছে, একটি দেশ আছে, সেই দেশের একটি ইতিহাস আছে, তার পরম্পরা আছে, তার শত্রু-মিত্র আছে। আর এগুলি তার জীবনে প্রভাব ফেলে। শ্রেণীবিহীন সমাজ তৈরির ঘোরে মার্কস এদিকে নজর দেননি।

মানুষে মানুষে ঐক্য থাকলেও বৈচিত্র স্বীকার করতে হবে। কোনো দু'জন ব্যক্তি একরকম হয় না। ব্যক্তির মতো পরিবার, সমাজ, দেশ সবেরই স্বাতন্ত্র্যতা আছে। দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যেক দেশেরই একটা ইতিহাস আছে, একটা ভূগোল আছে, কিছু পরম্পরা আছে, কিছু আদর্শ আছে— যাকে আমরা সেই দেশের 'চিতি' বলতে পারি। এই কারণেই একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের থেকে আলাদা। প্রত্যেক দেশই নিজের 'চিতি' অনুসারে নিজেকে তৈরি করে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার লড়াই করছিল, তখন বাসনা ছিল যে দেশ স্বাধীন হলে ভারত তার নিজের 'চিতি' অনুসারে গঠিত হবে। যে দেশ নিজের চিতি অনুসারে গঠিত হয় না, তার সমস্যারও শেষ থাকে না। যা এখন ভারতবর্ষের অবস্থা।

প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার তথা জাতির একটি নিজস্ব গুণ-ধর্ম আছে এবং একটি শক্তিও আছে। একতা তৈরির প্রয়াসে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক বৃত্ত নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করে পরবর্তী বৃহত্তর বৃত্তের পরিপূরক হবে— কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। এই যে পরিপূরকতার ভাব তাকেই উৎসাহ দেওয়া হলো— সংস্কৃতি। ভারতীয় সংস্কৃতি একাত্মমূলক। এই মূল বক্তব্যকে যদি একটি রেখাচিত্রে প্রকাশ করা যায়, তাহলে সেটি এইরকম হবে—

একে কুণ্ডলীন বা চক্রিল বা অখণ্ড মণ্ডল করে বলা যায়। প্রত্যেকটি মণ্ডলই আগেরটির এবং পরেরটির সঙ্গে যুক্ত। কখনও বিচ্ছিন্ন নয়।

পরিবার থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বিশ্ব পর্যন্ত মানুষের ধাপে ধাপে যে রূপ আমরা দেখি, বস্তুত তা তার আত্মচেতনা বিকাশের বাহ্যরূপ। ব্যক্তিচেতনা যত উন্নত, তত মাত্রায় তার সম্বন্ধ আরও উচ্চস্তরীয় হবে। তার মানে এই নয় যে, ক্রমাগত উচ্চস্তরে চেতনার উন্নতি হলে তার নীচু স্তরের সঙ্গে সম্বন্ধ নষ্ট হবে। এ পৃথকাত্মায় বিশ্বাসী নয়। নতুন সম্পর্কে যুক্ত হয়ে পুরনো সম্পর্ক ত্যাগ করে না। এ সর্ব সমাবেশক। আমি এক স্তরে ব্যক্তির সঙ্গে, দ্বিতীয় স্তরে পরিবারের সঙ্গে, তৃতীয় স্তরে সমাজ দেশ বা রাষ্ট্রের সঙ্গে, আরও এগিয়ে সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে একই সময় একই রূপ থাকতে পারি। ■

With Best Compliments from -

A Well Wisher